সংকেত

কথা আমিই অর্থাৎ উমানাথ মুখোপাধ্যায় বলছি কথক হিসাবে। উপন্যাস না গল্প না কারুর কাহিনী তা বলতে পারব না। তবে নাম দিলাম 'সিগন্যাল'। বলতে পারেন—সিগন্যাল-সংকেত উপাখ্যান, কথক আমি। সংকেতই ভাল। নামটা বলেছে আমাকে—যার কথা বলছি সেই। তার সঙ্গে আলাপের প্রথমেই যেটা চোখে পড়ল—সেটা তার দুটো চোখ। জবাফুলের মত লাল। না, যেন দুটো রক্তের ঢেলা। তার মধ্যে কালো তারার আভাস মাত্র জেগে রয়েছে।

আমার দেশের বাড়ী খড়ের চাল মাটির দেওয়াল বটে; কিন্তু দেখতে অতি সুন্দর, যে কোন রুচিসম্মত বাংলোর মত। সামনে বাগান আছে। বাগানটিও সুন্দর হয়ে গড়ে উঠেছে। লোক থমকে দাঁড়িয়ে দেখে যায়। একটি বাঁধানো নিমগাছতলা আছে—তার উপরে চারটি খুঁটির উপর খড়ের চাল, দেখে মনে হয় কোন তপোবন বা আশ্রম। আমি সেই নিমগাছতলায় বসে ছিলাম। পথিকের সারি চলেছে সামনের সদর রাস্তা দিয়ে। সব সেটেল-মেণ্ট আপিসের মক্কেল। থমকে দাঁড়াচ্ছে, দেখছে, চলে যাচ্ছে। তার মধ্য থেকে একখানা গামছা মাথায় দিয়ে একটি লোক এসে ভিতরে ঢুকল। লম্বা মানুষ, বেশ শক্ত কাঠামোর লোক। রঙটা গৌরবর্ণ। মাথায় গামছার ঢাকাটার জন্যে মুখখানা দেখে ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। তবে কদিন দাড়ি কামানো হয় নি এটা ঠিক এবং একজোড়া গোঁফ আছে। পায়ে একজোড়া টায়ার কাটা স্যাণ্ডেল। গায়ে একটা ঘরে-কাচা হাফশার্ট, পরনে লাল-নরুণ পেড়ে ন হাতি খাটো ধুতি।

একটু হেঁট হয়ে একটি নমস্কার করে বললে—শ্যামাপতিবাবু আছেন? শ্যামাপতি আমার ভাই; আমি তাকে বলি স্বাধীন আমলের রায়সাহেব। দেশের কাজকর্ম নিয়েই মেতে আছে। সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে। তাঁরা ওকে একটু পাগলা বলে থাকেন। অনেকে চটাও বটে। সে সাধারণ লোকেদের হাজার ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নিয়ে তাঁদের কাছে যায়, কাজ করিয়ে দেয়। ভাই বলে নয়, ভগবান মানি—তাঁর নামে হলফ নিয়ে বলতে পারি—সে এ থেকে কোন স্বার্থসিদ্ধি করে না। কাগজ-কলমে দখল থাকলে—আর মাথা একটু ঠাণ্ডা হলে—এবং কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ধরলে উপরে উঠতে পারত। হাল ধরবার শক্তি তার আছে—পেশী তার শক্ত কিন্তু বুদ্ধিটা সোজা ব'লে বন্দরে নৌকোর ভিড় ঠেলে এঁকে-বেঁকে কূলে এসে ভিড়তে পারলে না। ওর দলের কর্তারা ওকে স্নেহ ক'রেই বলেন দুর্বাসা। দুর্বাসা নামটা ঠিক দিয়েছেন তাঁরা—যেমন কটুভাষী তেমনি খড়ের মত চরিত্র—আগুন ঠেকলেই দাউ দাউ করে জ্বলে। থাক—তার কথা থাক; আগন্তুক তাকেই খুঁজছিল—আমি বললাম—এই তো ছিল—কোথায় গেল। বসুন, আসছে।

খানকয়েক লোহার চেয়ার পাতা ছিল—দেখিয়ে দিলাম। সে বসল না। বললে—আপনি উমানাথবাবু?

বললাম—হ্যাঁ।

সে নমস্কার ক'রে বললে—আজ আমার ভাগ্য। আপনাকে দেখলাম। দেখবার বাসনা

আমার অনেক দিন থেকে। বলে নিমগাছের ছায়ায় একটা বাঁধানো স্বতন্ত্র বেঞ্চির উপর বসে তার মাথার গামছাখানা সরালে।

এবার চোখ দুটো নজরে পড়ল। রক্তের ঢেলা দুটো, কালো তারার আভাস শুধু দেখা যাচ্ছে। নইলে ভাবতাম অন্ধ। বললাম—আপনার চোখে কি হয়েছে—এমন লাল। শিউরে উঠলাম।

সে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলে। বললে—শিউরে উঠছেন?

—তা উঠছি। কি হয়েছে? চোখ উঠেছে?

—না—ও কিছু না। ধরতে পারলেন না। ও হচ্ছে সিগন্যাল।

—সিগন্যাল? কিসের সিগন্যাল।

—রেড সিগন্যাল।

—রেড? আপনি পলিটিক্স করেন?

—করতাম। আর করিনে। কম্যুনিস্ট কংগ্রেস কিছুই নই। শুধু মানুষ। ও দুটো আমার পারসোন্যাল সিগন্যাল, লোককে বলে আমার কাছে এসো না।

কথাটার মধ্যে দাম্ভিকতা বা রূঢ়তা কি আছে বুঝতে পারলাম না। মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে যেন আর এক মানুষ হয়ে গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত বিনীত মানুষ একটি। কণ্ঠস্বর নিম্ন হয়ে গেল—সুরে বেদনা বা আক্ষেপ ফুটে উঠল। বললে—কাকে কি বলতে হয় সব সময়ে ঠিক থাকে না। মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা হয়। সব কিছুকে যেন বিষিয়ে দেয়। আপনাকে যে কত শ্রদ্ধা করি—আপনাকেই বলে ফেললাম কথাটা।

অনুতাপের বিষণ্ণতায় ভরা একটি হাসি তার মুখে ফুটে উঠল। আবার বিস্ময় অনুভব করলাম—একটা পাথরে খোদাই করা কঠোর মুখ-ভঙ্গীর মত মুখ এই হাসিটুকুতে শুধু প্রসন্ন কোমলই নয়, সুন্দরও হয়ে উঠেছে। কারণ বোধ হয় সুন্দর সুগঠিত মুক্তার পাতির মত দাঁত-গুলি। ঝকঝক করছে।

একটু ভাবছিলাম। সে বললে—একটু জল খাব।

বললাম—নিশ্চয়। রোদ্দুরে এসেছেন। ওরে ধীরেন। জল দে বাবা এঁকে। তারপর তাকে বললাম—কোত্থেকে আসছেন?

—ঘাটবলরামপুর থেকে। হেসে বললে—রাস্তা বেশী নয়, শীতকাল—রোদ্দুরও বেশী নয়। গ্রীষ্মের সময় চালের উপর বসে ঘর ছাইয়েছি। সে জন্যে নয়। আমার তেষ্টা পায় বড্ড বেশী। আগে পেত না। এখন এই চোখের ব্যামোর পর থেকে হয়েছে।

ধীরেন একটি প্লেটে দুটি মিষ্টি আর এক গ্লাস জল নিয়ে এসে আমার সামনের ছোট টেবিলটির উপর নামিয়ে দিলে।

—মিষ্টি? আমি শুধু জল খাচ্ছি।

আমি বললাম—ওটি আমার গৃহিণীর পূজার প্রসাদ এবং এটি তাঁর সংসারের নিয়ম।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—মিষ্টি আমি খাই না বাবু।

—খান না?

—না। নিমের পাতা খাই, নিমের ফল মিষ্টি বলে মুখে দিই নে। সে আমার চাকরের দিকে তাকিয়ে বললে—দুটো মুড়ি থাকে তো নিয়ে এস।

শান্ত নম্র কণ্ঠস্বর—কখন শক্ত হয়ে উঠেছিল টের পাই নি। শেষ কথা কটায় টের পেলাম। আবার সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম।

আমার গৃহিণী ভাগবত পড়ছিলেন বারান্দায়, তিনিও বিস্মিত হয়ে উঠে এসে বললেন—খাবেন না—কেন? ব্রত-ট্রত—?

—না, এমনি খাই না। সামান্য মানুষ, সামান্য কাজ করি—

আমি বললাম—কি করেন?

—করি? পাঠশালা করতাম। তা সে উঠে গেল। এখন মাটি কাটি, লাঙলও চালাই। সরকারী রিলিফে দিনমজুরও খাটি। আবার জাল বুনে তৈরী ক'রে বিক্রীও করি।

—জালও বুনতে পারেন?

—জাল ফেলতেও পারি।

—আপনি তো অসাধারণ লোক!

শান্ত নীরব হাসিতে মুখ ভরে উঠল। হাসলে সুন্দর দেখায় মানুষটিকে—সে এবার আরও সুন্দর হয়ে উঠল। কারণ হাসিটি এবার প্রশান্ত।

আমার গৃহিণী ইতিমধ্যে ঘরে গিয়ে একটি গ্লাসে কিছুটা দুধ নিয়ে ফিরে এসে দাঁড়ালেন। —খান।

—দুধ?

—হ্যাঁ। এ তো খাব না বললে চলবে না।

—না-না-না। আমার বাড়ীতে গাই আছে—নিজে সেবা করি, ঘাস কেটে আনি। খাওয়াই। বাড়ীতে আমরা দুটি প্রাণী। সে আর আমি। দুধ আমি খাই। দিন।

দুধের গ্লাসটি নিঃশেষে পান ক'রে জলের গ্লাস তুলে আলগোছে জল খেয়ে, হাত মুখ ধুয়ে নামিয়ে রাখলে। তারপর তৃপ্তির একটি আঃ শব্দ করে সে বললে—গত বড় বন্যার সময়। বুঝলেন? তিন দিন একটা চালের উপর বসেছিলাম—নিরম্বু উপবাস ক'রে। আর আমার সুরভি—ধ্বসে পড়া বাড়ীর মাটির উপর। তিন দিন—ওরই দুধ খেয়েছি বাঁটে চুমুক দিয়ে। জল থৈ থৈ চারিদিক—কলকল শব্দে বয়ে যাচ্ছে, তবু খাবার জল নেই। কাদা জল। ওই দুধেই জল পেয়েছি। আহার পেয়েছি। তিন দিন পর জল নামল। গ্রামের—আশপাশ গ্রামের বন্ধুরা—আমি তখন বামপন্থী বাবু। গোঁড়া বামপন্থী—কেউ খোঁজ করলে না। প্রথম খোঁজ করলেন শ্যামাপতিবাবু। এই দু কোশ দূর থেকে জল কাদা ঠেলে—

—আমার বাড়ী গ্রামের প্রথমেই। আমার বাড়ীতে এসে ডাকলেন—গোসাঁই আছ? আমি সেদিন তখন সবে একটা খড়ের গুটি মাটির ঢিপির তলা থেকে বের করে, ধুয়ে সুরভিকে

খাইয়েছি। সুরভির বাছুরটা ভেসে গিয়েছিল বানে। সুরভির বাঁট দুধ জমে টাটিয়ে ছিল—সে হাম্বা-হাম্বা শব্দ করে মরা বাচ্চাটাকে ডাকছে। আমার পেট জ্বলছে, গলা-বুক শুকিয়ে আছে—দুধটুকু খাব। এমন সময় ডাক শুনে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল দপ ক'রে; আবার বাবু ভালও লাগল—কোন মানুষ এল খোঁজ করতে। ডাকছে—দেখছে বেঁচে আছি কিনা। বললাম—কে? উনি বললেন—আমি শ্যামাপতি। নবগ্রামের। বেরিয়ে আসতে আসতে উনি ঢুকে থপ্ ক'রে বসে পড়লেন। জলে-কাদায় জামা-কাপড় একাকার, মোটা মানুষ হাঁপাচ্ছেন, বসেই বললেন—গাঁয়ের খবর কি বল তো। বললাম—তা তো জানি না, তবে আমি চালের উপর তিন দিন কাটিয়েছি। উনি ওঁর জলের বোতল খুলে জল খেলেন খানিকটা। আমি ওঁর হাত চেপে ধরে বললাম—আপনি এই দুধটুকু খান। ভদ্রলোক ভাল লোকের ছেলে, নামী লোকের ভাই, আমার বাড়ী এসেছেন, এইটুকু খান আপনি। উনি আমার হাত ধরে বললেন—গোসাঁই ভাই, তুমি ওটুকু খাও আমি দেখি। আমরা তো বানে ভুগি নি। আমরা তো ভাল মন্দ যেমন খাই খেয়েছি। তোমরা উপোস ক'রে আছ। তুমি খাও, আমি দেখি। অনেক কষ্টে এসেছি। নিজে কিছু আনতে পারি নি, তবে আসছে, চাল, ডাল, বিস্কুট, গুঁড়ো দুধ কিছু যোগাড় করেছি—তা আসছে জিপে। আমি ভোরে বেরিয়েছি। ওরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে যাবে। বুঝেছেন—আমি দুধটা খেলাম। ওই সুরভির দুধ খেয়েই ভরা পেটে মনে মনে বললাম—আর রামপন্থী-টন্থী নয়। মানুষ, শুধু মানুষ আমি। আমি মানুষকে ভালবাসতে চাই, পারি না, ওই দু-চারজনকে বাসি। দু-চারজনও কিন্তু আমাকে ভালবাসে না। এক-আধজন বাসে। আর বাসে আমার সুরভি।

আমার সমস্ত স্নায়ু-শিরার মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল, নির্নিমেষ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গোসাঁই? গোস্বামী? ঘাটবলরামপুরের নারান গোস্বামী? কেউ বলে—খুনে গোঁসাই। কেউ বলে—অসুর। আমি কাহিনী শুনেছি অনেকজনের কাছে—অনেক রকম। আমার কাছে বিচিত্র বিস্ময়কর মানুষ। আমার যদি নব মহাভারত লিখবার শক্তি থাকত, তবে তার মধ্যে একটি উপাখ্যান থাকত, নারান গোস্বামী উপাখ্যান—তার নায়ক হ'ত নারান গোস্বামী। ইতিহাসের হাজার কি পাঁচশো বছর আগেও যদি জন্মাতো, তবে হয় তো একটা বংশই সে স্থাপন করতে পারত।

আমি উঠে দুই হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। তুমি—নারান, আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। আমি এর আগে দু-তিনবার তোমাকে আসার জন্যে খবর পাঠিয়েছিলাম, তুমি আসো নি।

সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল—বার বার মৃদুস্বরে বললে—বাবু—বাবু! আমি—আমি। আমাকে ছাড়ুন। বাবু!

আমি বললাম—বাবু নয়। বরং দাদা বল।

—দাদা?

—হ্যাঁ। দাদা—

—দাঁড়ান ছাড়ুন, তা হলে—প্রণাম করি।

প্রণাম নিলাম। ধন্য মনে করলাম নিজেকে। নারান গোস্বামী সামান্য-বেশী মানুষটি তো সামান্য নয়। অসামান্য। বাংলার সেক্রেটারিয়েটে বিশ্ববন্ধু একজন ডেপুটি সেক্রেটারী। তার কাছে ওর কথা শুনেছি। বাংলার আইনসভার সভ্য প্রমোদবাবুর কাছে শুনেছি।

নারান বললে—না দাদা, আমি কাঁটা গাছ। আমি মরি না। পোড়ালে আবার জন্মাই কাটলে আবার গজাই। অমৃত-টমৃত জানি না। অমর বললে বলব, না; তবে মরণ আমার নাই। আমার কাঁটার ঘায়ে আমিও জ্বলি। এই দেখুন—কাঁধের হাড় উঠে আছে। মেরেছিল আমাকে। আরও দাগ আছে। এই দেখুন—কপালে একটা মাংসপিণ্ড, এক সময় পাথর দিয়ে নিজেই ঠুকেছি, মাথার যন্ত্রণাতেও বটে—জ্বালাতেও বটে।

মৃদু-শান্ত-প্রসন্ন কণ্ঠে বললে নারান।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ ক'রে বসে রইলাম। তারপর বললাম—কোথায় এসেছ, ভাই, এবার তো আমি খবর পাঠাই নি—আর আমিও সবে কাল এসেছি, একেবারে হঠাৎ এসেছি।

—একটু কাজ আছে দাদা সেটেলমেণ্ট আপিসে। সামান্য কিছুটা, কাঠা-দশেক জমি আমার আছে নদীর ধারে। ওইটে নিয়ে গোলমাল বাধিয়েছে ভূতু চাটুজ্জের ছেলেরা—ওই জমিটার ওপরেই ভূতু চাটুজ্জে খুন হয়েছিল। কিন্তু ওটুকু তো আমি দিতে পারব না। তাই শ্যামাপতিবাবুর কাছে এসেছি—উনি সেটেলমেণ্ট আপিসে আমার কাগজ-পত্র দেখিয়ে মিথ্যে ডিসপিউট যদি কাটিয়ে দেন। উনি বলেছেন—তা করিয়ে দেবেন। আমি বুঝি না, পারি না, তা নয়। কিন্তু—

চুপ ক'রে গেল নারান। স্থির মানুষটি অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। মুখ যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠছে। দাঁতে দাঁতে টিপে ধরে আছে বুঝতে পারছি, দুটো ঠোঁট পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় নিবদ্ধ কঠিন; চোয়ালের দুটো হাড়কে মনে হচ্ছে যেন চামড়া ঢাকা দুটো বোল্টের মত। নিজের নিষ্ঠুর ক্ষোভকে নিষ্ঠুরতর দৃঢ়তর শক্তিতে নাট্ কসে বোল্ট দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে।

আমি কোন কথা বললাম না। এ-যুগের মানুষের ক্ষোভ আমি জানি। রাজনৈতিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত দল কংগ্রেসের সভ্য আমি—কিন্তু তার চেয়েও আগে এবং তার চেয়েও সত্য আমি সাহিত্যিক। তাকে অস্বীকার করব কি ক'রে।

এবং বিশ্বাস করি—নারান আজ বামপন্থীও নয়, দক্ষিণপন্থীও নয়, সে যা বলেছে, তা সত্য, সে মানুষ। হয়তো যে জ্বালা তার বুকে—যে ক্ষোভ তার অন্তরে, তার সঙ্গে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস-এর সম্পর্কটাই সব নয়। হয় তো বামপন্থী ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও তার অন্তরে এখনও তার প্রভাব আছে। এবং নারানের ক্ষোভ হয় তো—নারানের ক্ষোভ। তার সঙ্গে অন্য মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। তবু পুরাণে আছে—এক-একটা মানুষের সারাজীবন অগ্নিদাহে জ্বলে—আর ভগবানকে অভিসম্পাত দেয়, তার সৃষ্টিকে অভিসম্পাত দেয়। জীবনের জ্বালাটা

বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে যায়। নারানের সে জ্বালা অবিরাম স্ফুরিত হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি —তার দুই চোখ দিয়ে।

মিথ্যে বলে নি নারান—ও দুটো রেড সিগন্যালই বটে। রক্তের ঢেলার মধ্যে কালো তারা দুটোর আভাস দেখে মনে পড়েছে—লাল কাঁচের পিছনে যে আলোটা জ্বলে ও দুটো যেন সেই আলো।

দুই

—না দাদা! নারানের উপাখ্যান নয়। নারানকে ভুলে যান।

—তবে কার উপাখ্যান? বল, তুমিই বল। নারানকে বললাম আমি।

হেসে বললে—দুঃখীরামের উপাখ্যান। মা-বাপ নাম রেখেছিল নারান; কিন্তু আসলে সে দুখীরাম। সংসারে দুখীরামের শেষ নাই, কোটি কোটি দুখীরাম, অসংখ্য কোটি দুখীরাম। সুখ-সুখ ক'রে ভিড় করে ছোটে। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, ঠেলাঠেলি করে। এক-দল একদলকে পায়ে দলে চ'লে যায়। হুঁচোট্ খেয়ে পড়ে। মরে। এরই মধ্যে দুটো-চারটে দুখীরাম থাকে দাদা—যাদের মরণ হয় না। কই মাছের প্রাণ।

একটু থেমে বললে—কোথা থেকে সে এত শক্তি পায়, তা বলতে পারি না।

* * *

ঘাটবলরামপুরে একটা ছেলে জন্মেছিল গোসাঁইদের বাড়িতে। হরি গোসাঁইয়ের এক মেয়ে এক ছেলে। হরি গোসাঁই বাস করেছিল শ্বশুরের ভিটেতে। শ্বশুরের দুই মেয়ে—বড় মেয়ের হরি গোসাঁইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তাকেই ভিটেতে রেখেছিল, ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল এক পোস্টমাস্টারের সঙ্গে, তার বাড়ী শহরে কলকাতার কাছে। টাকা দিয়ে বিয়ে দিয়েছিল—সে মেয়ে-জামাই থাকত সেখানে। ক্রমে গাঁয়ের লোক ভুলেই গিয়েছিল তাদের। হরি গোসাঁই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল তিন-চার ক্রোশ দূরে, জামাই সমর শহরে মোক্তারের মুহুরী। চাষীবাসী সংসার। নারানের আসল নাম দুখীরাম, ভগবান আমি মানি না—তবে ভগবান ছাড়া কার দেওয়া নাম বলব? বলতে পারি বাঘের মধ্যে যেমন চিতে-বাঘ আছে, গুল-বাঘ আছে, নেকড়ে-বাঘ আছে, ডোরা-বাঘও আছে, তেমনি মানুষের মধ্যে দুখীরাম আছে, সুখীরাম আছে, আরও হয়তো অনেক আছে। নারানের হল দুখীরামের জাত। হয়ে গেল তাই। হঠাৎ বাপ মরল, মা মরল, নারানের বয়স তখন বছর আষ্টেক; বাস, নারান নারান ঘুচে দুখীরাম হয়ে গেল।

ত্রিসংসারে আপনার মধ্যে বোন-ভগ্নীপতি—আর অনেক দূরে মাসী-মেসো। মাসী-মেসো চিঠি দিয়ে বোধ হয় খোঁজ করেছিল—তখন থাকত মেদিনীপুরে উড়িষ্যার ধারে। বোন আর বোনাই এসে নারানকে নিয়ে গেল। তখন সে দুখীরাম হয়ে গেছে।

এ উপাখ্যান দুখীরামের। বহু দুখীরামের মধ্যে একজন দুখীরাম।

ভগ্নীপতি রামহৃদয় মাস কয়েক পর সেদিন শুক্রবার সদর থেকে বাড়ী এসেছিল। কিছু কাল ছিল বাড়ীতে। দু-মাইল দূরে একটা বাস টার্মিনাস, সেখান থেকে হেঁটে আসে। শনিবার বিকেলে আসে সোমবার ভোরে উঠে চলে যায়। বেশী বোঝা থাকলে কুলী নিয়ে আসে, নইলে নিজেই আনে রামহৃদয়। সেদিন সময়টা শীতের প্রথম, এক ঝুড়ি কপি এনেছিল। শনি-রবি দুদিন সকালে কপি ঝুড়িটা গ্রামে বিক্রী করবে। পাঁচ টাকার জিনিস অন্ততঃ সাত আট টাকা হবে। হিসেবী লোক।

বাড়ীর দোরে নারান দুখীরামের দিদি লক্ষ্মী শঙ্কিত মনেই দাঁড়িয়ে পাশের প্রতিবেশী শিবু ভল্লাকে বলছিল, তুমি একবার যাও শিবু, মিয়াদের গিয়ে বল—আর এমন কখন হবে না। নারানকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। আজকের মত ছেড়ে দিতে বল।

দাওয়ায় বসে আট-বছরের নারান কেরোসিনের ডিবের সামনে একখানা প্রথম ভাগ খুলে রেখেছিল। পাশে খানিকটা মাটি। আসলে গড়ছিল সে একটা পুতুল।

রামহৃদয় থমকে দাঁড়িয়ে বললে—কি? কি হয়েছে?

—গরু।

—গরু কি? গরু?

—গাইটে পালের ছোঁড়াটা দেখে নি—কতকগুলো গরু ছটকে গিয়ে নদীর ধারে মিয়াদের তরীর ক্ষেতে ঢুকেছিল—মিয়ারা ধরে নিয়ে গিয়ে আটক রেখেছে।

রামহৃদয় কুলীটাকে বললে—নামা। এই নে। বলে একটা দোআনি দিলে তাকে।

সে বললে—দু-আনা কি মশায়?

দুহাত নেড়ে রামহৃদয় বললে—তবে কি দু-টাকা না কি মশায়? এই তো আধ ঘণ্টার পথ। সারাদিনে আট ঘণ্টা খাটলে আট আনা মজুরী। আধ ঘণ্টায় কত হয়? আধ আনা মানে দু পয়সা হয়। তার জায়গায় দু আনা দিয়েছি। আবার কি দেবে?

—যা বলছি যা?

বলেই সে দাওয়ার দিকে তাকিয়ে নারানকে দেখে ডাকলে—এই! এই! ওরে শূয়ার! নারানে!

চমকে উঠল নারান—এঁ্যা?

কাছে গেল হৃদয়—কি হচ্ছে কি?

—পড়ছি।

—পড়ছিস! পড়তে হবে না—উঠে আয়।

—এঁ্যা!

—উঠে আয় আমার সঙ্গে। গরু ডাকিয়ে আনতে হবে।

—আমার যে পড়া হয় নি। কাল পণ্ডিত মারবে যে!

কানে ধরে তাকে টেনে তুলে হৃদয় বললে—আজ আমি মারব শূয়ার কি বাচ্চা। উঠে

আয়। পড়ে তো হাইকোর্টের জজ হবি।

—উঠে আয়।

মিয়াদের বাড়ী থেকে গরু খালাস করে—সেই রাত্রে নারানই বেশ নিপুণতার সঙ্গে গরুগুলোকে তাড়িয়ে বাড়ী এনেছিল।

পরদিন সকালে হৃদয় দাওয়ায় বসে তামাক নিয়ে বসবার আগেই ডেকেছিল স্ত্রীকে—বলরামপুরের বউ। লক্ষ্মী উনোন ধরাচ্ছিল—হৃদয়ের জন্যে চা করবে। নারান মুখ হাত ধুয়ে মুড়ির জন্যে বসেছিল, খেয়ে পাঠশালা যাবে। লক্ষ্মী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে।—আমাকে ডাকছ?

—তোকে না তো—পরের পরিবারকে ডাকতে যাব?

লক্ষ্মী হৃদয়কে ভয় করে। হৃদয় হৃদয়হীন মানুষ, সে মারে লক্ষ্মীকে। এ নিয়ে হৃদয়ের কোন সঙ্কোচ নেই—লজ্জাও নেই। অকুতোভয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে—বেশ করছি মারছি। নিজের স্ত্রীকে মারছি। অন্যের গায়ে হাত দিলে ফৌজদারীতে নালিশ করিস। নইলে আমার সঙ্গে মারামারি করিস।

লক্ষ্মী তার কথায় হেসেই বলেছিল—সকাল বেলা কথার ছিরি দেখ দেখি। পরের পরিবারকে ডাকলে যে খেঁটে হাতে আয়ান ঘোষ বেরিয়ে আসবে।

হৃদয় কল্কেটা দিয়ে বলেছিল—সকাল বেলা মুখে আগুন দিতে বলছি। কল্কেতে আগুন নিয়ে আয়। আর কপিগুলো দেখ। যেগুলো একটু একটু শুকনো হয়েছে সেগুলো আলাদা করে সাজিয়ে দে একটা ডালায়। আর এক কাজ করবি। প্রত্যেকটা থেকে একটা দুটো ফুল ছাড়িয়ে নিবি। দশটা কপিতে একটা বেরুবে। পাতা নে—দুটো তিনটে করে।

লক্ষ্মী বলেছিল—বাবাঃ।

—হুঁ, বাবাই বটে। যা বললাম তাই কর। আর নারানে কোথায়? ও যাবে আমার সঙ্গে কপির ডালাটা নিয়ে। ঐ কালীতলায় ওকে বসাব, আমি দাঁড়িয়ে থাকব, বেচব।

—ও পাঠশালা যাবে না? ক্ষুণ্ণ এবং মৃদুস্বরে বললে লক্ষ্মী।

—পাঠশালা? না। পাঠশালা গিয়ে হবে কি?

লক্ষ্মী ঘরের ভিতর এসে নারানকে বলেছিল, নারান, আজ আর পাঠশালায় তোকে যেতে হবে না।

খুশী হয়ে উঠেছিল নারান। যেতে হবে না?

—না। তোর জামাইবাবুর সঙ্গে কপি বেচতে যাবি, কেমন? তাতে আরও খুশী হয়েছিল নারান।

লক্ষ্মী কিন্তু অপরাধী মনে করেছিল নিজেকে, বলেছিল—নইলে কতকগুলো কপি একেবারে খারাপ হয়ে যাবে। আজ আমাদের কপির তরকারী হবে। আয় আমার সঙ্গে কপি বাছবি।

নারান একমুহূর্তে অনুভব করেছিল যে সে মস্ত বড় কাজের লোক হয়ে উঠেছে। এবং কপির পাতা আর ফুল ভেঙ্গে নেওয়া কাজ বেশ নিপুণভাবেই করেছিল—বলতে গেলে লক্ষ্মীর থেকে। লক্ষ্মী হিসেব করছিল—ভয় করছিল ভেঙে নেওয়ার জোচ্চুরি বা চুরি খদ্দেরের কাছে ধরা পড়বে। নারানের সে হিসাব ছিল না। তা ছাড়া ওর হাতে একটি সহজ নিপুণতাও আছে।

সেদিন কপি বিক্রী করে ফিরে এসে খুশী হয়েছিল হৃদয়। বলেছিল, ছোঁড়া চালাক আছে। একজন একটা কপি কিনে আর একটা সরাচ্ছিল—ধরে ফেলেছে।

এই সময়েই গাঁইটে পালের রাখাল এসেছিল গরু খুলতে।

হৃদয় তাকে গতকালের ঘটনার জন্য তিরস্কার করে বলেছিল—যাঃ, তোকে আর গরু চরাতে হবে না। যা!

তারপর ডেকেছিল—নারানে! শোন!

নারান আঁচলে মুড়ি নিয়ে পেঁয়াজ আর লঙ্কা হাতের মুঠোয় ধরে পাশের ভল্লাপাড়ায় যাবার উদ্যোগ করছিল। ভল্লাপাড়াটা নারানের বড় ভাল লাগত। ভল্লাদের পেশা চাষ। তরীর চাষে ওরা আশ্চর্য চাষী। তার সঙ্গে ওরা শরীর-চর্চা করে, লাঠিয়ালি ওদের বংশানুক্রমিক নেশা। বড় বড় বিয়েতে ওরা রায়বেঁশে নাচে। নানান রকম কসরত দেখায়। গানও করে। ওদের জীবনে অভাব অনেক। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ, আশ্চর্য সহ্যশক্তি। তার মধ্যে ওরা কাঁদে না—দুঃখ গেয়ে বেড়ায় না, ওরই মধ্যে ওরা হাসে। হা—হা করে হাসে। এককালে ওরা ডাকাত ছিল। কয়েকজন দাগীও আছে। নানান গল্প করে, বিচিত্র বিচিত্র গল্প।

ভূতের নাম করলে হা হা করে হাসে। রাম ভল্লার একটা গল্প তার আজও মনে আছে। ভল্লাদের বাড়ীতে ওই গল্পটাই সে প্রথম শুনে আকৃষ্ট হয়েছিল। গল্প হচ্ছিল 'পেত্যা'র অর্থাৎ আলেয়ার।—রাম বলেছিল—বছর দশেক আগে 'পেত্যা' দেখা দিলে। নদীর ধারে লোকে বলতে লাগল—এক জোড়া পেত্যা ঘোরে। পেত্যা আমার দেখা ছিল। আগে একবার দেখেছিলাম। ধরেছিলাম। ওই নদীর ধারে ধারে চলে আসত। আসত ওই দণ্ডেশ্বর তলা থেকে। দপ-দপ করে জ্বলতে জ্বলতে চলে আসত—এসে ঢুকত ভোগপুরের যোগিনী তলায়। লোকে বলত—ওই গাঁয়ের পাড়ার চাঁড়ালের মেয়ে কামিনী কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরেছে—এ হল—সে। আমি বলি দেখব একদিন। নানান কথা বলত। দূরে থেকে নাকি দেখেছে কেউ কেউ। ওই যোগিনী তলার সন্নেসী বলত—সর্বাঙ্গ চামড়া ওঠা একেবারে খেতির মত। মাথার চুল পোড়া। সে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আমার ভয়ও লাগত, আবার ভারী ইচ্ছেও হ'ত। কি হবে? তারপরে একদিন যা হয় হবে ব'লে রাতে উঠে নদীর ধারে—লাঠি একগাছা নিয়ে বসে থাকলাম। টেনে নেশা করলাম। তারপর হঠাৎ দণ্ডেশ্বর তলায় দপ করে আলো জ্বলল। নিভল। আমার বুক ধড়াস করে উঠল। মনে হল—ছুটে পালাই। কিন্তু তার পরেই ধমক দিলাম নিজেকে—খবরদার রামা! তারপর আসতে লাগল, দেখতে

তো পাই না অন্ধকারে, হঠাৎ দেখলাম রশি খানেক এগিয়ে এসে আবার দপ। এবার দপ-দপ-দপ করে বার তিনেক। আবার অন্ধকার। আবার রশি খানেক পরে। দেখতে দেখতে কাছে। দপ করে জ্বলতেই দেখলাম—সাদা মূর্তি। আমাতে তখন আমি নাই। কিন্তু তার-পরই মনে হল কাপড়। হ্যাঁ কাপড়।—আবার দপ। এবার দেখলাম পুরো চেহারা। হাত। পা। আলো জ্বলছে মাথায়। হাঁ-হাঁ। সোজা উঠে দাঁড়ালাম।—ডাকলাম—কে?

—এ্যাঁ—। বলে চেঁচিয়ে উঠল।

আমি তখন বুঝেছি। লাঠি তুলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম—মারব লাঠির বাড়ি। ফেল—ফেল—মাথার সরা।

এবার চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। এগিয়ে গেলাম।—কে? কে তু?

কথা কয় না। মাথায় ঘোমটা টেনেছে। টেনে খুলে দিলাম—ঘোমটা। মেয়েটা আছড়ে পড়ল পায়ে—তুমি আমার বাবা।

আমি মাতাল তখন—তার ওপর ভর্তি জোয়ান, তবু পিছিয়ে এলাম—বললাম—করছ কি মা। তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যে। তোমার বাবাকে গুরুর মত ভক্তি করি।—ওঠ মা ওঠ! কিন্তু এ কি কাণ্ড মা?

কাণ্ড ওই—যোগিনী তলার সন্নেসীর কাছে রাতে আসে বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যে। সন্নেসী বললে—আমি কি করব বল? আমি বারণ করি। কিন্তু ও শুনবে না।

আমি বললাম—তা হবে না—তুমি ওকে নিয়ে যাও ভৈরবী করে। আর শোন, যদি কখনও এই কন্যে ফিরে এসে বলে যে—তুমি ফেলে পালিয়েছ তবে আমি ব্রেহ্মাণ্ড খুঁজে—লাঠির ঘায়ে মাথা ভেঙ্গে দিয়ে আসব। চল আজই রাতে চল তোমাদিগে জংশনে রেলে তুলে দিয়ে আসি। তাই দিয়ে এসেছিলাম।

এবার বুঝলি—জোড়া পেত্যা। হুঁ, বুঝলাম খেলটা জমিয়েছে ভাল। দুজনাতে দুটো সরা মাথায় নেত্য করে লীলা করে। বেরিয়ে গেলাম রাত্তিরে। সন্দ হয়েছিল শক্ত ব্যাপার। মানে পেরায় সারা রাত ছুটোছুটি করে। সঙ্গে নিলাম অবিনেশকে। ছোঁড়াটা শক্ত। গেলাম দুজনায়। দেখলাম হন-হন করে যেন সাইকেলে চড়া মানুষের বেগে—আলো দপ দপ করে জ্বলতে জ্বলতে ছুটে আসছে। মধ্যে মাঝে একই জায়গায়—খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করে পাক খাচ্ছে। কি ব্যাপার। অবিনেশ একবার বু-বু করে উঠল। আমি বললাম—এই-ই। আর এই। ছোঁড়া তখন পিছু ফিরেছে। দে ছুট। আমি বললাম—যা শালা। যাওয়াই ভাল। কোথা ভিরমি খেয়ে পড়বে! বিপদ হবে, যাওয়াই ভাল। এক পা এক পা করে নদীর শরবনের আড়াল দিয়ে ওদের পানেই এগুলাম।—তখন কোথা গেল আর ঠাওর পাই না। হঠাৎ বুঝলি কি না, হাত চারেক দূরে দপ ক'রে আলো জ্বলল। চমকে উঠলাম। এ কি রে বাবা! এ যে চারপেয়ে জন্তু রে! কুকুরের মতন। যা হবে হবে বলে সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে দিলাম লাঠি—জয় কালী। চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে পড়ে গেল। আর একটা তখন হ্যা-হ্যা করে তেড়ে আসছে আমাকে—যত হ্যা-হ্যা করে হাঁ করছে—তত দপ দপ করে আলো

জলছে। আমি আবার লাঠি তুলে হাঁকড়ালাম। কিন্তু লাগল না। জন্তুটাও পালিয়ে গেল। একটুকুন দাঁড়িয়ে থেকে মরা জন্তুটাকে টেনে নিয়ে এলাম। চামড়াটা নুন দিয়ে মুচিদের ঘরে দিলাম। শেয়াল। একরকম শেয়াল।

আশ্চর্য লাগত। নারান দুখীরাম আশ্চর্য সুখের আস্বাদ পেত ওই গল্পের মধ্যে। বোধহয় ভল্লাদের নিজেদের চেয়েও বেশী। তাই ছুটি পেলেই নারান যেত ভল্লাপাড়ায়।

সেদিনও নারান যাচ্ছিল—ওই ভল্লাপাড়াতেই। মস্ত বড় হুঁকোটা নিয়ে রাম ভল্লা বসে আছে বকুলতলায় ওদের শিব-কালী-হরি সব ঠাকুরের মাটি-বাঁধানো আটনের সামনে—চ্যাটাই বিছিয়ে—হয় লাঠি বানাচ্ছে, নয় জাল বুনছে, নয় গায়ে জুত পাচ্ছে না বলে—উঠ-বস করছে, ডন টানছে, নইলে কোন একটা তরুণ জোয়ান পিঠের উপর দুহাত মুঠো বেঁধে গুম-গুম শব্দে কিল মারছে। মেয়েরা ঘুঁটে দিচ্ছে, ধান মেলে দিচ্ছে পায়ে পায়ে, ঢেঁকিতে ধান ভানছে, অল্পবয়সীরা কাঠ কুড়ুতে যাবার জন্যে দল বেঁধে দাঁড়িয়েছে—বাকী সঙ্গিনীদের ডাকছে—কই লো সাবি—হ'ল? পাড়া থেকে বেরিয়েই গান ধরবে একসঙ্গে, নদীর ধারের ওলাতে লো ফুল ফুটিছে মটর লতাতে!

সে গেলেই রাম বলত—এস ঠাকুর, এস!

মেয়েরা তাকে বলত—ছোট্‌ঠাকুর!

ভল্লাপাড়ায় ছিল তার স্বপ্নরাজ্য!

সেদিন পা বাড়াতে ভগ্নীপতি হৃদয় তাকে ডেকে বলেছিল—শোন—। এই যে মুড়ি নিয়ে আঁচলে। ঠিক হয়েছে। গরুগুলো খোল। ডাকিয়ে নিয়ে যা—নদীর ধারে। খবরদার, যেন কারুর ক্ষেতে না ঢোকে। তা হলে তোমার পিঠের চামড়া তুলব। সেই তিনটের সময় বাড়ী আনবি। এসে চান ক'রে খাবি। বুঝলি!

দিদি লক্ষ্মী ছুটে বেরিয়ে এসেছিল—না!

খুব গম্ভীরভাবে হৃদয় বলেছিল—কি?

—গরু চরাবে কি—

—হ্যাঁ চরাবে। গাঁইটে পালে গরুর চরাট ভাল হয় না। তাছাড়া এই সব ঝঞ্ঝাট!

—তাই বলে—বামুনের ছেলে—

—বামুনের ছেলের চারটে হাত বেরিয়েছে। বামুনের ছেলে! বামুনের ছেলে হল ত হল কি? স্বয়ং কৃষ্ণ গরু চরিয়েছেন। গাঁইটে পালে—পয়সা লাগে।

বলেই হেঁকে বলেছিল—নারানে খোল গরু খোল।

নারানের খারাপ লাগেনি। ভালই লেগেছিল। সে তৎক্ষণাৎ একগাছা কঞ্চির লাঠি হাতে নিয়ে গরুগুলো খুলে—তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল—নদীর ধারের দিকে। যে দিকে ভল্লাদের ছেলেরা গরু চরায়।

* * *

নারান গোসাঁই—সুন্দর কথক। কথা বলতে বলতে তার চেহারা পাল্টেছে। সে হাসছে,

মধ্যে মধ্যে হৃদয়ের কথা বলতে বলতে বেশ রস মিশিয়ে দিচ্ছে। বলছে কিন্তু শান্ত মৃদু কণ্ঠে। হঠাৎ থেমে টেবিলের উপর থেকে জলের গ্লাস তুলে নিয়ে জল খেলে। একটি বিড়ি ধরালে। একটি দুটি মৃদু টান দিয়ে আকাশের দিকে তাকালে। তারপর আশ্চর্য কণ্ঠে বললে—নীল আকাশ ঠিক আর দেখি না আমি। আকাশের দিকে আলোর দিকে তাকাতেও তো পারি নে। রাতের আকাশের দিকে তাকাই। তখন কিন্তু নদীর ধারে নীল আকাশ বড় ভাল লাগত।

জানেন—নদীর ধারের সব খুব ভাল লাগত। আকাশ ভাল লাগত, নদীর জল ভাল লাগত। বালির ওপরে হাঁটু জল তর-তর করে বয়ে যেত। দহ ছিল একটা, অনেক জল। সেখানে স্রোত বোঝা যেত না। দহতে ঝাঁপ খেতাম। সাঁতার কাটতাম। নদীর ধারে শরবন—তার আড়ালে আড়ালে লুকোচুরি খেলতাম। সবুজ ঘাস হ'ত। ঘাসে কত হরেক রকমের ফুল ফুটত। কুচি-কুচি ফুল। লাল, সাদা, বেগুনে, হলুদ। কোন দুঃখ ছিল না। দিদি দুঃখ করত—নারান করত না। দিদি কপালকে মন্দ বলত, সে বলত না। পৃথিবীতে দুখীরামদের সুখ খুঁজে নেবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ক্ষমতাটা তারা অর্জন করে। তার উপর আর একটা সত্যি আছে দাদা—সেটা হল—মায়ের পেট থেকে নিয়ে জন্মানোরা শক্তি। সুখীরামরা এটা বেশীর ভাগ হারায় সুখের মধ্যে বড় হয়ে, দুখীরামদের এটা বাড়ে নারানের এটা বেড়েছিল দিন দিন। কত হুঁচোট যে খেয়েছে, কত কত যে গাছ থেকে পড়েছে, কত যে বিছে কামড়েছে, বোলতা কামড়েছে, মৌমাছি কামড়েছে—তার ঠিক নেই। হুঁচোট লেগে মধ্যে মধ্যে পায়ের আঙুল পাকত। নিজেই বাবলার কাঁটা ভেঙ্গে তা দিয়ে ফুটিয়ে পুঁজ বের করে দিত। একবার কাঁকড়া বিছেতে কামড়েছিল। সারা দিনটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। দিদি সন্ধ্যাবেলা খুঁজে ওই ভল্লাদের বাড়া থেকে নিয়ে গিয়েছিল। তখন অবিশ্যি খানিক সোর হয়েছে। এরই মধ্যে বড় হচ্ছিল—ভল্লাদের কাছে লাঠিখেলা শিখেছিল, শূন্যে ডিগবাজী খাওয়া শিখছিল, মানে ভণ্ট খাওয়া। দেহ যেমন শক্ত হয়েছিল—মনও তেমনি আশ্চর্য উল্লাস, উৎসাহ-ময় হয়ে উঠেছিল। সমস্ত দুঃখ-ভয় যেন দূরে পালিয়েছিল—অনেক দূরে। একবার একটা শেয়াল ধরেছিল। একদিন নদীর ধারে দেখে গর্ত—একটা লেজ বেরিয়ে আছে, বেশী নয় সামান্য খানিকটা। আর চারিপাশে অনেক সদ্য খোঁড়া মাটি। শেয়ালটা গর্তের মধ্যে খরগোশের সন্ধান পেয়ে নখে গর্তটা খুঁড়ে তার মধ্যে ঢুকেছে। নারান কিন্তু শেয়াল বলে বুঝতে পারেনি। সে ভেবেছিল লেজটা খরগোশেরই। বেরিয়ে ছিল লেজের ডগাটা। সে খপ করে লেজের ডগাটা চেপে ধরে টানতে শুরু করেছিল—প্রাণপণে টেনে যখন অর্ধেকটা বের করেছিল—যখন চিনেছিল শেয়াল বলে। কিন্তু তখন সে ছেড়ে দিতে পারেনি। উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে অবাধ বিচরণ ক'রে প্রকৃতির শুধু রূপ-স্নেহকেই চেনে নি—তার ক্রোধ, তার হিংসাকেও জেনেছিল। গাছে উঠে পাখীর বাচ্চা পাড়তে গিয়ে পাখী মায়েরই ঠোক্কর খায়নি; বাচ্চাটাও কামড়ায়, নখ ফোটায় তা জেনেছিল। সে জানত—শেয়াল এমনি দেখলে ছুটে পালায়, কিন্তু আঘাত খেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করে।

জানত শেয়ালের নখে দাঁতে শুধু ধারই নেই, তাতে বিষও আছে। সুতরাং ছেড়ে সে দেয়নি; সকল শক্তি প্রয়োগ করে টেনে বের করেই সে সেটাকে দুই হাতের জোরে পাক দিয়ে ঘোরাতে শুরু করেছিল। বার-কয়েক পাক দিয়ে সে পাকের মুখেই সেটাকে ছেড়ে দিতেই সেটা ছিটকে আছাড় খেয়ে গিয়ে পড়েছিল খানিকটা দূরে। বেশ একটু দূরে। তারপরই দুই হাতে তুলে নিয়েছিল একটা মোটা পাথর। শেয়ালটা কিন্তু একটু নিঝুম হয়ে পড়ে থেকে কোনরকমে উঠেই দিয়েছিল চোঁ-চা দৌড়া। দুঃখের কথায় নারান গোঁসাই হেসে শান্ত কণ্ঠেই বললে—সেদিনেই দুঃখের কথায় মনে হয় কি জানেন বাবু—মনে হয় দুঃখ সেদিন শেয়ালটার মতই ছুটে পালিয়েছিল নারানের কাছ থেকে।

সুখ। নারান বললে সেদিনের সুখের কথা মনে হলে—মনে পড়ে যায় একটা বুনো লতার কথা। নদীর ধারের জঙ্গলে হয়েছিল—বারো মাস ফুল ধরত, আর গাছের মাথায় মাথায় বেড়েই চলেছিল, বেড়েই চলেছিল—আর তলায় জন্মাত হাজার চারা। চারা বের হত শিকড় থেকে। গরুতে খেতো, মানুষের পায়ে দলত, মেয়েরা কেটে কেটে খড়-কুটো করত—কিন্তু তার শেষ নেই, উপরেও নেই—তলাতেও নেই।

* * *

প্রথম বছর দুয়েক সে সকালে উঠে পাঠশালাটা যেত কিন্তু বাড়ীতে পড়ত না—পড়বার সময় হ'ত না বলে সেখানে পড়াটা পারত না। দিদি ধান-চাল বিক্রি করে মাইনে যোগাতো, তাও বাকী পড়ত। পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু পণ্ডিতের কাজ সে করে দিত অনেক। দশ বছর বয়স যখন, তখন সে শক্ত হয়ে উঠেছে। ভগ্নীপতির বাড়ীর মাটির দেওয়াল পড়ে গেলে, সেটা সে তুলে দিতে পেরেছে। ঘর-দোর লেপতে পেরেছে; বাবুই সাবুই খড়ের দড়ি পাকাতে পেরেছে। খড়ের চালে ঘরামী ছাইতে উঠলে সে খড় ছুঁড়তে পরেছে, দড়ি যোগাতে পেরেছে। চালে উঠে একটু আধটু কাজ পেয়েছে। গরুর খড় কোটা, শাক-সব্জীর জন্য জায়গা কোপানো, সার দেওয়া, গাছের যত্ন করা এও শিখছে সে। আর তাতে তার ওই লতাটার মত ফুল ফোটানোর উল্লাস।

বিড়ি তামাকও ধরেছে! তামাক কাটতে মাখাতে কাঠের হামানদিস্তেতে ছেঁচতে—তাও সে পারে।

কাজেই গুরুমশাই তাকে তাড়াননি। আর মনের মধ্যে একটি অফুরন্ত সুখই বলুন, আর উল্লাস.উৎসাহই বলুন—তার জন্যে পড়তেও ভাল লাগত তার; আর দু-চারবার যা পড়ত—তা সহজে ভুলত না। দ্বিতীয়ভাগ ধারাপাত শেষ করেছিল।

দু বছর পর দিদি লক্ষ্মীর ছেলে হল। ছেলেকে নিয়ে দিদি মাতল—সঙ্গে সঙ্গে মাতল নারান। তার উল্লাস আনন্দের শেষ ছিল না। লোকে এর মধ্যে কানাকানি করছিল—করছিল—হৃদয়ের বউয়ের ছেলে আর হবে না। আর কবে হবে? আঠারো-বিশ বয়স হয়ে গেল। হৃদয়ও নাকি বিয়ে করব করব করছিল। কিন্তু বিয়ে করতে পারছিল না দুটো কারণে। প্রথম হৃদয়দের টাকা দিয়ে বিয়ে করতে হয়। কন্যাপণ লাগে। লক্ষ্মীর জন্যে তার

বাবাকে নগদ দেড়শো টাকা দিয়েছিল হৃদয়। এবার দ্বিতীয় পক্ষে আরও বেশী লাগবে। আর একটা কথা—নারানের সাত বিঘে জমি। তার ধান হৃদয় গিয়ে গিয়ে নিয়ে আসে ঘাটবলরামপুর থেকে। একটা পুকুর আছে, মাছ ঠিকে আছে জেলেদের কাছে—বছরে পঁচিশ টাকা জমা পায়। বিয়ে করলে লক্ষ্মীর সঙ্গে নারানও চলে যাবে হয়তো। ওটাও লোকসান হবে। তবে হৃদয়ের ভয় যাই এবং যতই হোক—লক্ষ্মীর ভয় উদ্বেগ তার থেকে অনেক বেশী ছিল। তাই সন্তান হতেই তার আর খুশির সীমা ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে নারানেরও।

ভল্লাপাড়ায় রাম জিজ্ঞাসা করত—ছেলে কেমন গো?

—ভাল—ভাল!

—ক দিনের হল?

—পাঁচ বছরের! দিনে বলতে নেই। য দিনের তত বছরের বলতে হয়, তাতে ছেলের পরমায়ু বাড়ে।

ছেলে তিন মাসের হতে হতে নারান পাঠশালা বন্ধ করলে, ছেলেটির সামনে সকালে বসে সে তাকে আদর করত—বাবু-রে, বাবু-রে, বাবু-রে! কিছুদিনের মধ্যে সে যতরকম ছেলে আদর করার ছড়া আছে এখানে, তা' শিখে ফেলেছিল। ছ' মাসের হতেই সে তার কোলে উঠল, এক বছর হতেই নারান তার ঘোড়া হল। এ সমস্তের মধ্যেই আশ্চর্য উল্লাস ছিল তার। কোনদিন ভাবত না, তার এটা নেই সেটা নেই—ভাবত না সে ছোট কি বড়। ভাবত না তার ভবিষ্যৎ। সমাজ, মানুষ, ভগবান—কাউকে কিছুর জন্য সে দায়ী করে না। সামনে যা বাধা এসেছে তার যে কোন ইচ্ছার পথে, তাকে সে নদীর বন্যার স্রোত ঠেলে পরমোল্লাসে এগিয়ে যাবার মত এগিয়ে গেছে।

নারান দুখীরামই ছিল। দুঃখ ওর পায়ের তলায় পিছনে দুই পাশে ওকে জড়াতে চেষ্টা করত—কিন্তু নারান ছুটত সামনে, দুঃখকে অনবরত পিছনে ফেলে। দুঃখের সঙ্গে দেখা হত না। ক্বচিৎ দেখা হ'লে ওই শেয়ালটার মত লেজে ধরে পাক দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত—দুঃখ ছুটে পালাত—সে হাসত।

—একবার হয়েছিল বাবু, ওই ভল্লাদের একটা যুবতী মেয়ে নদীর ধারে পাশের গাঁয়ের বাবুদের একটা বাগানে কালজাম ফলেছিল, পেড়ে খাচ্ছিল। নির্জন নদীর ধার,পুরনো আম-জামের বাগান।

ওখানে রেশম-কুঠী ছিল সায়েবদের,তাদের লাগানো বাগান। জাম-আম খুব ভাল। জাম ছিল বিখ্যাত। মোটা কালো মিষ্টি রসে ভরা জামগুলি বেশ বড় বড়—তা দোকানে তৈরী কালোজাম মিষ্টির মত বটে। বেটি লোভ সামলাতে পারেনি; গাছে উঠেছে। উঠবার সময় ঝুড়ি নিচে রেখেছে, কাপড় ছেড়ে গামছা পরেছে। কাপড়ে জামের কষ লাগলে ওঠে না। মনের আনন্দে জাম খাচ্ছে। আমি নদীর ধারে ভল্লাদেরই এক মোষের পিঠে শুয়ে আছি। মোষের পিঠে বসার চেয়ে শোয়াতে আরাম—চওড়া পিঠ—আর মোষের গুণ হল, দৌড়ায় না—আর পিঠ ঝাড়ে না। হুঁশ রাখতে হয়—কখন বসছে, আর কখন জলে

নামছে। নইলে হেলে দুলে চলে, শুয়ে ভারী আরাম লাগে। বেটা রোদের তাপে বাগানটায় ঢুকে পড়েছে। ছায়ায় দাঁড়িয়েছে। নিস্তব্ধ বাগান। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। চিঁ-চিঁ। আমবাগানে ঝিঁঝিঁদের অহোরাত্রি! দিনরাত ডাকে। মোষ বেটা বসল, আমি উপুড় হয়ে গলা জড়িয়ে ধরলাম। এমন সময় কথা শুনতে পেলাম।

—নাম বলছি—নাম। নাম। নইলে দেখেছিস বন্দুক।

ঘাড় তুলে দেখলাম—পাশের গাঁয়ের বাবুদের একটা ছোকরা জাম গাছের দিকে বন্দুক তুলেছে। এবার কথা শুনলাম—আমি চেঁচাব। মেয়ের গলা।

ছোকরা বললে—চেঁচাবি?—আমি চেঁচাব, দাঁড়া—তুই কাপড় ছেড়ে গাছে উঠেছিস। কাপড়টা নিয়ে আমি চলে যাব! যা—ওই গামছা পরে যা বাড়ি!

ওদের গামছা তেমনি গামছা বাবু। কোন রকমে কোমরটা ঢাকে, বুকে ওঠে না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বুঝলাম মতলব। ওরে ছোকরা বাবু, অল্পবয়সী মেয়েটার খোলা বুক দেখে মদের মত গেঁজেছো।...নারান উঠল। গাছের আড়ে আড়ে গিয়ে পিছন দিক থেকে বন্দুকটার নল ধরে খ্যাঁচ করে টেনে কেড়ে নিলে। জানতো না তো। ওই টানেই বন্দুকটা কি রকম ফায়ার হয়ে গেল আর গুলিটা নারানের এই বগলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। নারান হতভম্ব হয়ে পড়ে গেল কি রকম, আর বন্দুকটা পাশে পড়ল আছড়ে! বুঝলেন—সঙ্গে সঙ্গে বাবুদের ছোকরা দৌড় দৌড়—দে দৌড়। মনে করেছে নারান খতম। নারান হতভম্ব হয়েছিল কিন্তু বাবু ছোকরার দৌড় দেখে তা কেটে গেল—হা হা হেসেই সারা হল। ছুঁড়িটা নেমে এল। নারান বললে—কাপড় পর—বাড়ী চল।

রামভল্লা বাবুদের বাড়ী গিয়ে টাকা আদায় করে বন্দুক দিয়ে এল। নারানের কিন্তু দুঃখ ছিল। হৃদয় দাদা বাড়ী এসে বাবুদের বাড়ী গিয়ে সব শুনে নারানকে আগাপাশতলা পিটন দিলে। ঘরে ভরে রেখে দিলে। খেতে দিলে না।

সে কিন্তু গায়ে লাগে নি। ছোকরা বাবুর ছুটে পালানো যত ভেবেছে নারান তত হেসেছে।

লোকের কাছে রটে গেল নারানের চরিত্র খারাপ।

রামভল্লা বলেছিল—ছোট্ ঠাকুর এবার নষ্ট চাঁদের রাতে তোমাকে চাঁদ দেখতে বারণ করেছিলাম। হ'ল তো!

নারান খারাপ কথা বলেছিল একটা। শিখেছিল বই কি! ওদের কাছে ওদের ঝুলিতে যা ছিল তাই পেয়েছিল—তাই শিখেছিল।

বিড়ি খেতো, তামাক খেতো। মদ ওরা চোলাই করত। এবং প্রচুর খেতো। নারান মদ চোলাই করতেও শিখেছিল। কিন্তু মদ খেতো না। কেমন গন্ধ লাগত, গা-টা ঘুলিয়ে উঠত। তা ছাড়া—ছেলেবেলা মা মারা যাবার পর যে এক বছর বাবা বেঁচেছিল—সেই এক বছর তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। বাবা অবস্থাপন্ন কায়স্থ ঘরে শালগ্রামের সেবা করতেন। সুন্দর পুরুষ ছিলেন বাবা, ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন; নারানকে যা শিখিয়েছিলেন তিনি, কিংবা

নারান তাঁর কাছে যা শিখেছিল, তাতে ঠিক মনে না পড়লেও, মদ খাওয়া যেন বারণ করেছিলেন আর মাতালকে তিনি ঘেন্না করতেন। নইলে নারান মদ খেতো। মদ চোলাই যে একটা বিদ্যা বাবু। সে বিদ্যাটা সে শিখেছিল।

রামকে বলত মধ্যে মধ্যে—এটা কেন কর? কেন খাও রাম?

রাম হা-হা করে হাসত। কিন্তু কখনও বলে নি—তুমি খাও। বরং চোলাইয়ের সময় নারান যখন অন্যদের মত প্রবল উৎসাহে কাজ করত তখন সে বলত—ঠাকুর, একি নেশা বল দেখি তোমার? মদ খাবে না অথচ—।

নারান বলত—বিদ্যে তো একটা রাম!

রাম বলত—আর বিদ্যে ঠাকুর! ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে লেখাপড়া শিখলে না, গরু চরালে ঘরের দেওয়াল দিতে শিখলে, ঘর ছাওয়াতে শিখলে, জাল বুনতে শিখলে—জাল খেয়া দিলে, দড়ি পাকালে, কুমোরদের কাছে ঠাকুর গড়বার সময় ঘোরো—। ভগিনপোতের জমিতে লাঙ্গল চালাও, বীজ মার, ধান পোঁত, ধান কাটো। ভাগনেকে কাঁধে করে বেড়ালে—শিখলে না শুধু বামুনের কাজ, লেখাপড়া কুলকম্ম। কপাল তোমার!

নারান বলেছিল—পড়তে আমি পারি রাম। পাঠশালা যাই না। কিন্তু দিদির বাড়ীতে একটা মোটা রামায়ণ আছে সেটা আমি পড়ি।

—তবে তো মেলাই পড়লে। এবার তোমাকে জজ ম্যাজিষ্টর ক'রে দেবে।

—শুধু রামায়ণ নয় রাম, জামাই দাদা যাত্রার বই আনে, বাড়ীতে আছে, তাও পড়ি।

রামহৃদয়ের শখ বলতে যাত্রাদলে পার্ট করা। পাশের গাঁয়ের শখের যাত্রাদলে বড় পার্ট করে। সেই বই বাড়ীতে আনে। ফাঁক পেলে নারান তাও বানান করে পড়ে। বুঝতে পারে তার কারণ হৃদয় যাত্রা করতে যায়, নারানকে নিয়ে যায়। যাত্রাদলে নামলে সে মদ খায় বেশী। নারানকে সামলাতে হয়। নারানকেও দলে নামাতে চেয়েছিল। কিন্তু নারান বক্তৃতা করতে পারে না। তার উপর হেসে ফেলে। বক্তৃতা শুনে শুনে এমন হয়েছে যে, বইটায় একটা শব্দ পড়তে পারলেই বাকীগুলো মনে পড়ে, পড়া সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু রাম তাতেই হাসলে।

* * * *

হঠাৎ একদিন একটা চিঠি এল। পোষ্টকার্ডের চিঠি। নিয়ে এল রাম। রাম গিয়েছিল যে গ্রামে সায়েবরা রেশম-কুঠী করেছিল সেই গাঁয়ে। বীটের পিওন তাকে চিঠিটা দিয়ে বলেছিল—দেখ্ রাম, ওই হৃদয়ের পরিবারের নামে চিঠি। চিঠিখানায় লিখছে শুক্রবার দিন ওদের বাড়ীতে কলকাতা থেকে কুটুম আসবে। হৃদয়ের পরিবারের মাসী। ওদের চিঠি তো কখনও আসে না, তাই পড়ে দেখলাম। তা তোদের গাঁয়ে বীট সেই শনিবার। শুক্রবার কুটুম আসবে, বাসে নামবে, এখানে লোক রাখতে বলেছে—গাড়ী রাখতে বলেছে। মাসীর হাঁপানি আছে। নেমে তো আতান্তরে পড়বে রে! তুই দিস—তোদের পাশেই তো বাড়ী।

রাম চিঠি এনে লক্ষ্মীর হাতে দিয়ে মুখে সব খবরটা বলেছিল।

লক্ষ্মী বলেছিল—মাসী কলকাতা থেকে আসছে? ক্যানেরে বাবা। নিজের জ্বালায় মরি! ক্যানে আসছে লেখে নাই?

রাম বলেছিল—পিওন তো তা বলেনি।

নারান ঘস ঘস করে খড় কাটছিল—লক্ষ্মী তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—ওই এক বামুনের ঘরের গরু। মুখ্যু ডাং। এত বড় ছেলে ঘরে থাকতে পরকে পড়াতে যেতে হবে চিঠি।

নারান উঠে এসে চিঠিখানা ফস করে টেনে নিয়ে পড়তে চেষ্টা করেছিল। লক্ষ্মী বলেছিল—দে দে—চিঠি দে। পড়িয়ে আনি, ঘোষালদের বাড়ী।

—পড়তে পারছি। বেশ গোটা লেখা দিদি—সাবি—সাবি—সাবি—ত্রী সমানেষু। মা—ল—হ্যাঁ লক্ষ্মী, তুমি আমার—

—ও সবাই পড়তে পারে। দে আমাকে দে। বাচলামো করিস নে বলছি। আমার সময় নেই। বলে লক্ষ্মী চিঠিখানা টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিল খানিকটা দূরে ঘোষালদের বাড়ী।

নারান রামকে বলেছিল—আমি পড়তে পারছিলাম না রাম? এই সব ছোট ছোট দুঃখ সে পেত। হৃদয়ের কাছে নয়। দিদির কাছে। ওই রামের কাছেও পেতো। কিন্তু দুনিয়া তাকে দুঃখ দিতে পারত না। রাম বলেছিল—তা পড়ছিলে তো বাপু। সাবিত্তিরি সমানেষু তো পিওন বলে দেয় নাই, আমিও বলি নাই, তুমি পড়লে। তবে গড় গড় করে পড়তে হবে তো! দিদি সেই রাগে নিয়ে গেল আর কি। আর কি বলে, কোথা কি ভুল হয়।

রাম চলে গেল। নারান খড় কাটতে বসছিল, খোকা উঠল ঘুম থেকে। কেঁদে উঠল। নারান তাকে দাওয়ার উপর পাতা বিছানা থেকে কোলে তুলে নিল। খোকা দেড় বছরের হয়েছে। সে মামার ভয়ানক ন্যাওটা। মামা তাকে ঘাড়ে করে বিষ্ণুকে বহন করে গরুড়ের মত প্রায় উড়ে বেড়ায়। মামা তাকে খড় কাটার জায়গার কাছে বসিয়ে দিয়ে খড় কাটতে লাগল। খোকার কথা ফুটেছে। কথা কয়। নারান তাকে বললে—তুই বেটা খুব লেখা-পড়া শিখবি বুঝলি! ইংরিজি পড়বি। ফরফর করে ইংরিজি বলবি। তখন তোর কাছে আমি শিখব। বুঝলি। না কি বলবি? গেট আউট, ভাগো মুখ্যু কোথাকার? হুঁ হুঁ, এক চড় মারব তা হলে। তোর বাবাকে খাতির করি বলে তোকে খাতির করব না।

লক্ষ্মী ফিরে এল গজ গজ করতে করতে। আসছেন! আমাকে কেতাত্ত করতে আসছেন। মা লক্ষ্মী, আমি তোমার বাড়ীতে আগামী শুক্রবার সন্ধ্যায় যাইব। বড় হাঁপানিতে কষ্ট পাইতেছি। মরণও হইতেছে না। চিকিৎসার কিছু হইল না। তাই তোমাদের ওখানে বাবা কলেশ্বরের ওখানে যাইব। বাবার স্বপ্নাদ্য ঔষধ চিরকাল বিখ্যাত। তাহা ছাড়া সাধু বাবা আছেন। রবিবার ঔষধ দেন আমার মনে আছে। শুক্রবার যাইব। শনিবার থাকিয়া রবিবার ঔষধ লইয়া আবার সোমবার ফিরিব। বাসের ওখান হইতে তোমাদের বাড়ীও

হাঁটিয়া যাইতে পারিব না। গাড়ী একখানি রাখিয়ো, ভাড়া আমি দিব। আমার সঙ্গে আমার ভাসুরঝি যাইবে।

মাসীকে মেসো বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিল দিদির জন্মের আগে। হিরণহাটি গাঁয়ে পোস্ট-মাস্টার হয়ে এসেছিল। ঘাটবলরামপুর হিরণহাটির পাশেই। মেসোও ছিল আচার্যি বামুন। ওদেরও বিয়ে করতে টাকা লাগত। সে কলকাতা অঞ্চলেও লাগত। কালটা তো আজকের নয়। যে সময় মাসী হাঁপানিতে ভুগে আসবে বলে চিঠি লিখেছিল—সেটাই ছিল ১৯৩৫ সাল। তারও পঁচিশ বছর আগে মাসীর বিয়ে হয়েছিল। মেসোর কাছে টাকা নেয়নি। নারানের মাতামহ কিন্তু লিখিয়ে নিয়েছিল এখানকার সম্পত্তি তারা পাবে না। মাসী সুন্দরী ছিল। মেসো রাজী হয়েছিল তাতেই। আর পাড়া-গাঁয়ে বাস করতে আসবার ইচ্ছেও ছিল না। বিয়ের পর থেকে বিদেশে বিদেশে ঘুরেছে মাসী। কখনও কখনও পত্র দিয়েছে। একবার না কি এসেছিল দাদামশায়ের মৃত্যুর পর। তখন দিদি লক্ষ্মী হয়েছে। নারান হয়নি। তারপর একবার পত্র দিয়েছিল নারানের মায়ের মৃত্যুর পর। কলকাতার পাশে দমদমে ওদের বাড়ী। তখন ওরা দমদমেই ছিল মেসোর ছুটিতে। দুটাকা নৌকুতো পাঠিয়েছিল। দিদির বিয়ের সময় মাসী মেসো দুজনেই এসেছিল। দিদিকে আশীর্বাদী দিয়েছিল, কানের দুল। বাবার মৃত্যুর পর হৃদয় পত্র দিয়েছিল, সে পত্রের জবাব আসে নি। এবং কিছুদিন পর ঘাটবলরামপুর থেকে গোবিন্দ নাপিত ওখানকার রায়েদের বাড়ীর ক্রিয়াতে নেমন্তন্ন পত্র বিলি করতে এসেছিল এ গ্রামে। সে-ই একখানা চিঠি এনে দিয়ে গিয়েছিল। গ্রামে পিওন বিলি করতে এসে—কাউকে না পেয়ে দিয়ে গিয়েছিল ওখানকার বর্ধিষ্ণু বাড়ী রায়েদের বাড়ীতে। রায়ের গোবিন্দের হাতে চিঠিখানা দিয়ে বলেছিল, ও গ্রামে তো যাচ্ছিস—চিঠিখানা আমাদের গোসাঁইয়ের জামাই হৃদয়কে দিস। তাতে ছিল মেসো মারা গেছে। মাসী দমদমের বাড়ীতে আছে।

লক্ষ্মী একবার কাঁদতে হয় বলে কেঁদেছিল। নারানের দুঃখ-টুঃখ কিছু হয়নি। একটু আপসোস হয়েছিল, মেসো ছিল শুনেছে কিন্তু দেখতে পেলে না।

দিদি বলে মেসো যা শৌখীন লোক ছিল। পোস্টমাস্টার তো কিন্তু আমাদের গাঁয়ের বড়লোকদের চেয়ে বাবুলোক ছিল। চোখে সোনার চশমা। সুন্দর শার্ট। আর সর্বদাই ফিট্-ফাট জামাতে একটু কিছু লেগেছে তা আঙুলের টোকা দিয়ে এমন ঝাড়তো যে সঙ্গে সঙ্গে ময়লাটা চলে যেত। খেতো ভালো। যা-তা মুখে রুচত না। আমার বিয়ের সময়, মা, সে লুচি খেলেই না। সেই রাত্রে মাসী নিজে হাতে রুটি গড়ে দেয় তবে খায়।

ওই কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল দিদি সেদিন। পরদিন থেকে আর নাম হয় নি। মাসীরও না মেসোরও না। হৃদয় কোন পত্র দেয়নি।

এতদিন পর মাসীরও পত্র এল—মাসীর হাঁপানি হয়েছে। মাসী কলেশ্বরের শিবের ওষুধের জন্য এখানে আসছে, দু-দিন থাকবে।

আসবে থাকবে দুদিন, তাতে অন্যায় কিছু হয় না। তবে হৃদয় যে ভিন্ন জাতের মানুষ।

কিন্তু আর উপায় তো নেই, কাল শুক্রবার। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে লাগছে।

নারানের কিন্তু উৎসাহের সীমা ছিল না। মাসী আসছে, মাসীকে দেখবে। কলকাতার মাসী। আরও আশ্চর্যও লাগছে—মাসীর সঙ্গে ব্যাটাছেলে কেউ আসছে না। এক ভাসুর-ঝি আসছে।

ওই ভাসুর-ঝিকেই নাকি মাসী মানুষ করেছে। মাসীর তো ছেলে-পুলে হয়নি। মাসীর হাতে অনেক টাকা। সারা জীবন চাকরী করেছে মেসো।

* * *

মাসী সত্যিই কলকাতার মাসীর মত মাসী বটে।

ধবধব করছে রঙ। দিদি বলে—মাসীকে সুন্দর দেখে বিয়ে করেছিল মেসো। নারানের মাও ফরসা ছিল—দেখতে ভাল ছিল। একটা দুটো ছবি নারানের একটু একটু মনে আছে। মা তার পুকুরঘাটে চান করত। সে অল্প জলে খেলা করত। আর একটা ছবি মনে আছে—মা তার পুজোর থালা হাতে রায়েদের ঠাকুরবাড়ী পুজো দিতে যেতো দুর্গাপুজার সময়। আর কতকগুলো খুব টুকরো—মা ভাতের হাঁড়িতে হাতা দিচ্ছে। সামনের ঘরটা ঝাঁট দিচ্ছে এমনি। কিন্তু মার সঙ্গে মাসীর রঙের তুলনা হয় না। মাসীর চেহারা বলতে খুব রোগা নয়। মুখ চোখ বুড়িয়ে গেলেও খুব ভাঙেনি। চুল পেকেছে অনেক। বড় বড় চোখ। পরনে শেমিজ তার উপর থান কাপড়—ধবধবে ধোওয়া, কিন্তু হাঁপাচ্ছে। কথা বলে থেমে থেমে, মধ্যে মধ্যে কাশে। গলায় ঘড় ঘড় সাঁই সাঁই শব্দ ওঠে। তার সঙ্গে একটি এগার বারে বছরের মেয়ে। মেয়েটি কালো, নাকটা টেপা। চোখ দুটি টানা নয়, কিন্তু ডাগর। মাথায় চুলগুলি সুন্দর করে আঁচড়ানো। চুলে খোঁপা বাঁধা নয়—মোটা একটা বিনুনী, তাতে ফিতে বাঁধা। গায়ে লাল রঙের জামা। পরনে ডুরে শাড়ী। সব থেকে আশ্চর্য হয়ে গেল নারান—মেয়েটির পায়ে চটি।

ছই বেঁধে রামের গাড়ীটা নিয়ে নারান একলাই গিয়েছিল বাস স্ট্যাণ্ডে। মাসী আর মেয়েটি নেমে দাঁড়িয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখছিল। মাসীর হাতে একটা ছোট খাঁচি। শালপাতা দিয়ে মোড়া। বাসের লোকটা একটা মাঝারি সাইজের টিনের সুটকেস নামিয়ে দিলে।

নারানের চিনতে কষ্ট হল না—মাসীর আর সঙ্গের মেয়েটির পোশাক দেখে—আর চেহারা দেখে। আশ্চর্য, কালো রঙ যে মেয়ের, নাকটা যার টেপা এবং ছোট; তাকেও এমন সুন্দর লাগে!

নারান গিয়ে মাসীকে প্রণাম করে বলেছিল—আমি নারান!

—নারান। তুই! অবাক হয়ে কিছু দেখেছিল তার মধ্যে তার মাসীমা।

মেয়েটিও অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। প্রায় তার সমবয়সী। নারান কিছু বড় হবে। সে বলেছিল—তোমার বোনপো? খুড়ীমা?

—হ্যাঁ। তারপর নারানকে বলেছিল মাসী—হ্যাঁরে, গাড়ী এনেছিস তো!

—হ্যাঁ মাসী। বেশ ভাল করে খড় বিছিয়ে এনেছি। ওই যে।

—ও যে মোষ রে!

—তা হোক না। গরুর থেকে মোষ ভাল মাসীমা। ভারী শান্ত—ওর পিঠে আমি শুয়ে থাকি।

—ও মা! শিউরে উঠল মেয়েটি।—কিছু বলে না? ফেলে দেয় না?

—না। হেসেছিল নারান। খুব শান্ত। কোন ভয় নেই। একটু আস্তে যাবে। তাতে আরামে যাবে।

—কে জানে। মাসী বলেছিল, গাড়োয়ানকে খুব সাবধানে নিয়ে যেতে বলবি যেন!

হেসে নারান বলেছিল—আমিই নিয়ে যাব মাসী। আমিই গাড়োয়ান হব।

—সে কি রে? তুই গাড়োয়ান হবি কি? তবে আমি যাব না বাবা। এখানেই আমায় কোথাও একটু জায়গা দেখে দে কারুর বাড়ীতে, ভাড়া দেব।

—কোন ভয় নেই মাসী। আমি খুব ভাল গাড়োয়ানী করি। জামাইদাদার ধান আমিই গাড়ীতে তুলে আনি। ধান বেচতে নিয়ে যাই ষাঠ পলষার হাট। তুমি চড়, কিছু ভয় নেই।

বাসের ক্লীনার বলেছিল—হ্যাঁ মা, যান। ও ছোকরা খুব হুঁশিয়ার, আমরা হরদম দেখছি।

তার অভয় পেয়ে মাসী গাড়ীতে চলেছিল, বলেছিল—ভাল ক'রে ধর মোষ দুটোকে।

তবে সে ধরেছিল—সঙ্গে সঙ্গে এই ভয় দেখে অনেক কৌতুকও সে অনুভব করেছিল। মাসীর পর মেয়েটি উঠেছিল খুব সন্তর্পণে। নারান গাড়ীটা তুলে মোষ দুটোর কাঁধে চাপিয়ে অভ্যাস মত কৌশলে মোষের পিঠে হাতের ভর দিয়ে টুপ করে চড়ে বসেছিল গাড়ীতে। পেটে পায়ের টোকা দিয়ে মোষ দুটোকে জিভের ক্যাঃ ক্যাঃ শব্দ ক'রে চলতে ইঙ্গিত করেছিল। গাড়ীটা চলতে শুরু করেছিল।

মাসী এরপর তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—হ্যাঁ-রে নারান!

—মাসী!

—কোন্ ক্লাসে পড়িস রে?

—আমি পড়ি নে মাসী।

—পড়িস নে?

—না।

—তবে?

এর উত্তর দেয় নি নারান। কি উত্তর দেবে? মাসী কিন্তু ছাড়ে নি। বলেছিল—হ্যাঁ নারান!

—এঁ্যা।

—পড়িস নে তো করিস কি?

—কি করব ? কাজকর্ম দেখি ঘরে। গরুবাছুর দেখি, চরাই, চাষবাষ দেখি। আবার হাতও লাগাই। ধান কাটি। দিদির ছেলে নিয়ে থাকি।

—কত দূর পড়েছিস ?

– ওই পাঠশালাতে দু বছর পড়েছিলাম।

—তারপর ?

—তারপর আর কি ? ছেড়ে দিলাম। বাড়ীর কত কাজ। ছেলে দেখা। কত হবে এক সঙ্গে ?

—হুঁ। ফেল করে ছেড়ে দিলি ?

—না, ফেলটেল করিনি। সময়ে কুলোল না। জামাইদাদা রাগ করতে লাগল। দিদিরও খুব কষ্ট হচ্ছিল। তো ছেড়ে দিলাম। দিদিও বললে।

গাড়ীটা নদীর ঘাটে ঢালে নামছিল। হুড়হুড় ক'রে। মেয়েটি চীৎকার করে উঠল—ওকি করছ, পড়ে যাবে যে—উল্টে যাবে যে—

নারান হেসে বলেছিল—না।

মাসী বর্ধমান থেকে ছোট চ্যাঙারি ক'রে সীতাভোগ মিহিদানা এনেছিল। দিদির ছেলের হাতে দুটো টাকা দিয়েছিল। দিদির ভারমুখ একটু হাসি-হাসি হয়ে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। প্রণাম ক'রে বলেছিল—পথে খুব কষ্ট হয়েছে—না মাসী ?

মাসী বলেছিল—রেলে তো খুব কষ্ট হয়নি মা। মেয়েদের গাড়ী দেখে চড়েছিলাম, ভিড় ছিল না। বাসে কষ্ট হয়েছে—যা রাস্তা—আর যা ভিড়! তবু মেয়েছেলে দেখে বসবার জায়গাটা দিয়েছিল। কিন্তু যা তোমাদের পথ! খাল ডিং—দুম-দুম করে পড়ছিল। তার-পর এখানটুকুর কথা কি বলব মা।

কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছিল—কি বলব বাবা কলেশনাথের নাম নিয়ে এসেছি—আর এই রোগের যাতনায় এসেছি। রাত্রে বসে কাটাতে হয়। দম আর পড়ে না। নইলে ওখান থেকেই ফিরতাম তোমাদের মোষের গাড়ী দেখে। কি চাউনি মা!

দিদি খুব হেসেছিল। বলেছিল—কি করবে বল মাসী—যে দেশের যা। এ তো কলকাতা নয়। তা এইটি বুঝি ভাসুর-ঝি!

—হ্যাঁ, ওই আমার নিরু। নিরুপমা। ভাসুরের তিন তিনটে মেয়ে—ওকে আমি নিয়েছিলাম আঁতুড়ে। ওর মায়েরও খুব অসুখ করেছিল। আর সেই অসুখেই গেল। আমার কাছেই আছে।

—তা এইবার তো দায় এসেছে তোমার। বিয়ে দিতে হবে—নিরু মুখে হাত চাপা দিয়েছিল হাসি চাপতে। মাসী বলেছিল—বিয়ে কোথায় এখন মা—কলকাতায় তো পাড়া-গাঁয়ের মত নয়, দশ পেরুতেই বিয়ে। ও এখন পড়ছে। পড়ুক।

—পড়ছে ? ইস্কুল যায় ?

—হ্যাঁ। পাড়ার ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি।

—কলকাতার কথাই আলাদা। তা একলা ইস্কুলে যায়?

—যায় বই কি। কে নিয়ে যাবে।

দিদি নিরুকে বলেছিল—বাঃ, তুমি তো খুব বাহাদুর মেয়ে।

নিরু আবার হেসেছিল।

মাসী এবার বলেছিল—তা হ্যাঁ লক্ষ্মী, নারান পড়ে না কেন? বললে—পড়ে না—পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

লক্ষ্মী চুপ করে ছিল। একটু পর বলেছিল—কি বলব মাসী ওর কপাল!

—লেখাপড়ায় মন নেই বুঝি? না—বুদ্ধি নেই?

—বুদ্ধি ওর খুব মাসী। যা দেখে—তাই শিখে ফেলে। কিন্তু মন ঠিক নেইও বটে—আর মিথ্যে বলব না তোমাকে—তোমার জামাই—। চুপ করে গিয়ে বললে—বাড়ীতে তো আমি থাকি—সে বিদেশে—ঘরের কাজকর্ম, চাষবাস দেখবার লোক নাই—বললে। আর নারানও সঙ্গে সঙ্গে লেগে গেল। দেখ না—এতবড় বামুনের ছেলে, পৈতে হল না।

আবার একটু চুপ করে থেকে দিদি বললে—তুমি ওকে নিয়ে যাও না মাসী! তোমার তো অনেক টাকা! ওকে পড়াবে। তোমার ঘরে ও চাকরের মত খাটবে—দেখো!

মাসী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—না—লক্ষ্মী। আমার টাকা নেই রে। সে তোর মেসোই খুইয়ে গেছে। রিটায়ার করে এসে ব্যবসা করতে গেল। তাতেই সব গেল মা; শেষ বাড়ীর অংশ—তাও গেল। ভাসুরের গেল—ওঁর দুজনের, পৈতৃক বাড়ী। ছেড়ে শেষ ভাড়ার বাড়ী। ওঁর পেনসন ছিল—কোন মতে দিন চলেছে। এখন নিজের গহনা বিক্রী করে চালাচ্ছি। ভাসুর মারা গেছেন—দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—একটা ছেলে ছিল—সে কোথায় চলে গেছে ঠিক নেই। এখন ওই মেয়ে ঘাড়ে। লেখাপড়া শেখাচ্ছি। শিখতে পারলে—যা হোক কিছু করবে—মাষ্টারী-মাষ্টারী। নইলে বিয়ে। তাই বা কি করে দেব তা জানি না।

লক্ষ্মী বলেছিল—কেন মাসী! আমাদের ঘরে তো মেয়ের বিয়েতে টাকা পায় গো!

হেসে মাসী বলেছিল—কলকাতায় সে সব দিন বদলে গেছে মা। সে সব আর নেই। ভাসুরের বড় মেয়ের বিয়ে—এমনি এমনি হয়েছিল—পণ লাগে নি। মেজ মেয়ের বিয়েতে আড়াই হাজার লেগেছিল। যত কাল যাচ্ছে—তত মেয়ের বিয়ের খরচা বাড়ছে। তার ওপর রঙ কালো, অনেক টাকা লাগবে।

নিরু বলে উঠেছিল—কি সব যা' তা বলছ খুড়ীমা? আমি বিয়ে করব না।

মাসী হেসে বলেছিল—ওই দেখ, মেয়ের লজ্জা হচ্ছে। থাক ও সব কথা। এরপর একটু চুপ ক'রে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—মাসী তোর বড়লোক নয় রে। গরীব। তোদের চেয়েও গরীব। তারপর মাসী একে একে সব খোঁজ নিয়েছিল। ঘাটবলরামপুরের—লক্ষ্মীদের সংসারের।

জিজ্ঞাসা করেছিল—সেখানকার বাড়ী আছে তো ?

—আছে। মধ্যে মধ্যে ছাইয়ে আসে, তবে লোক না থাকলে ভাঙা ভগ্ন হয়। তাই হয়েছে। অনেক দূর তো! বাড়ীর দরজা নিয়ে গেল চুরি করে। জানলায় উই লাগল। তখন—সেগুলো ছাড়িয়ে বিক্রী করে দিলে। যখন যাবে—তখন করবে নারান।

—জমিগুলি ?

—হ্যাঁ। ধান বছর বছর গিয়ে নিয়ে আসে।

—তা হ'লে তো ওই থেকেই ওর পড়া হয় রে। ওই জমি থেকেই তো ওর বাপের সংসার চলত।. আমার বাপের চলত।

লক্ষ্মীদি এবার চুপ করে গিয়েছিল। একটু ভেবে বলেছিল—সে সব ওকে হিসেব ক'রে দেবে। তা কি দেবে না ? নিশ্চয় দেবে।

হৃদয়দা বলেছিল—কঞ্জুষ কিপ্‌টে মাগী কোথাকার! গরীব! তো গরীবের মত কথা বলে না কেন—লম্বাই-চওড়াই বাত কেন ?

কথাটা বলেছিল—মাসী চলে যাওয়ার পর। শনিবার সন্ধ্যেতে হৃদয় যেমন আসে তেমনি এসেছিল। একটু মদ খেয়েই সে আসত। পকেটে একটা শিশি থাকত। এখানে এসে চোলাই খেত। ভল্লাদের কাছ থেকে নারানকেই এনে দিতে হত।

মাসীকে দেখে—সে একটু খুশী হয়েছিল। বড়লোক মাসী এসেছে! লক্ষ্মীদের কাছে বৃত্তান্ত শুনে বলেছিল—দূর! দূর! দূর! খোকাকে কিছু দিলে ?

লক্ষ্মী বলেছিল—দু হাতে দুটো টাকা দিয়েছে।

—দু টাকা ? যা—যা! তোকে কি দিলে ?

—দেয় নি কিছু। একখানা নিজের সিল্কের শাড়ী এনেছে, দেবে।

—পুরনো! কানা কুকুর মারে সন্তুষ্ট!

লক্ষ্মী চুপ করে ছেলের কপালের চুলগুলি সরিয়ে দিয়েছিল! হৃদয় আবার বলেছিল—নারানকে কি দিলে ?

—কই ? কিছু তো দেখিনি!

—এই নারানে!

নারান কাছেই দাঁড়িয়েছিল। কোঠার উপরে মাসীকে আর নিরুকে শুতে দিয়ে লক্ষ্মী নিচের ঘরে শুয়েছিল, নারান বারান্দায় শুয়েছিল।

নারান বলেছিল—কিছু দেয়নি।

—যা দেবে—দিবি দিদিকে। বুঝলি! আমি তো চলে যাব সকালে। দেবে কিছু, গাড়োয়ানী করছিস! দেবে।

তা করেছিল সে। সেই নিয়ে গিয়েছিল কলেশনাথতলা। সঙ্গে দিদি গিয়েছিল। হৃদয়ও গিয়েছিল। মতলব ছিল হৃদয়ের। কলেশনাথতলায় পাশের গ্রামের সারখেলরা অবস্থা-

পন্ন লোক—ওদের নিজেদের শ্রেণীর লোক। মানে ওরাও কন্যা-পণ দিয়ে বিয়ে করে; বিয়ে দেয়। সারখেলদের একটি ছেলেকে নিয়ে এসেছিল। সে তাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে নিজেদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে সে দিন খাইয়েছিল। ভাল বাড়ী ঘর। টিনের চাল, পাকা দাওয়া। উঠানে তিন চারটে বড় বড় মরাই। বড় বড় গরু। খুব আদর যত্ন করে ছিল তারা। নিরু বেড়াচ্ছিল—নারানের সঙ্গে, নারান তাকে পাড়াগাঁ দেখাচ্ছিল। কলেশনাথের মন্দির—সাধুবাবাকে দেখে সেই বলেছিল, নারানদা—ওই ওখানে কি সব ফুল ফুটে রয়েছে সাদা লাল। কলেশ-নাথের মন্দিরের দক্ষিণদিকে প্রকাণ্ড মাঠ। তার মধ্যে একটা মজা দীঘি। সেই দীঘিতে ফুটেছিল শালুক ফুল—সাদা গোলাপী আর গাঢ় লাল রক্তকমল। সময়টা ছিল চৈত্র মাস। খোলা মাঠ; মধ্যে মধ্যে তরির জমিগুলি সবুজ হয়ে আছে, কিছু কিছু জমিতে তিল ফসল হয়েছে। তাতে ফুল ধরতে শুরু করেছে আর বাকীটা সবই ফাঁকা, ধুলো উড়ছে। দূরে কটা পলাশ শিমুলের গাছে—দুটো চারটে লাল ফুল ফুটে রয়েছে। এর মধ্যখানে দীঘিটাতে ফুটেছে ফুল—অজস্র ফুল—আর মাথার উপর ঝাঁক বেঁধে উড়ছে সরালি হাঁস।

নারানের সঙ্গে নিরুর কাল অল্প কিছু ভাব হয়েছিল। কিছু ভাব। নিজেদের গ্রামটা তাকে দেখিয়েছিল। নদীর ধার, দহ, শিবতলা—তার প্রিয় স্থান ভল্লাপাড়া—এ সব দেখিয়েছিল। সে তাকে বলেছিল কলকাতার গল্প—চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, পরেশনাথের বাগান, সিনেমা, তার ইস্কুল মাস্টার, দিদিমণিদের গল্প করেছিল। ভল্লাপাড়ায় এসে—নারান নিজেও অপ্রস্তুত হয়েছে—নিরুকেও বিব্রত করেছে।

রামের স্ত্রী বলেছিল—ওমা, তোমার সিঁতিতে সিন্দুর কই গো? না বিয়ে হয় নাই?

নারান বলেছিল—কলকাতায় ছোটতে বিয়ে হয় না।

—ছোট! ছোট কিসের গো? বিয়ে হলে যে ছেলে হ'ত এতদিন!

নিরু চটে উঠেছিল—সে বলেছিল—কোথাকার অসভ্য তোমরা? নারানদা আমি চললাম। ছি! ছি! বলে সে ফিরে চলেছিল হন হন করে। নারানও খুব লজ্জা পেয়ে তার পিছন পিছন আসছিল। নিরু থমকে দাঁড়িয়ে—মা গো! বলে চীৎকার করে উঠে পিছন ফিরে নারানকে দেখে বলে উঠেছিল—সাপ!

—সাপ? কই? নারান নিরুকে পিছনে রেখে এগিয়ে গিয়ে পথের উপর একটা হেলে সাপকে দেখে হেসে উঠেছিল। বলেছিল—এই সাপ।

—মস্ত সাপ।

সাপটা এঁকে বেঁকে পালাচ্ছিল—নারান হেলেটার লেজে ধরে তাকে একপাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল—হেলে। ওর বিষ নাই।

—কি ডাকাবুকো তুমি? যাও হাত ধোও গে

—ক্যানে? হাত ধোব ক্যানে? কিছু হবে না।

—তুমি খুব নোংরা।

ধাক্কা খেয়েছিল নারান—নোংরা সে? নিরু থামে নি, বলেছিল—তুমি ওই অসভ্যদের

সঙ্গে মেশো কেন? ওই ভল্লাদের সঙ্গে?

তারপর বলেছিল—লেখাপড়া না শিখলে মানুষ অসভ্যই থেকে যায়।

নারান ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আর কাছে যায় নি। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাও লক্ষ্মীদিকে কলকাতার নানান গল্প বলছিল যখন—তখন অবাক হয়ে শুনেছিল। শুধু চিড়িয়াখানা মিউজিয়ম নয়, কলকাতায় স্বদেশী আন্দোলনের গল্প করেছিল। গান্ধীজীকে দেখেছে নিরু। সুভাষচন্দ্রকে দেখেছে। অটোগ্রাফের খাতায় তাঁর সই আছে।

নারান তখন অটোগ্রাফ কাকে বলে জানত না। মনে মনে একটু সম্ভ্রম জেগেছিল। তাই কলেশনাথ তলায় যখন ওই পুকুরে ফুল দেখিয়েছিল—তখন সে ছুটে গিয়েছিল ওই পুকুরে।

পুকুর থেকে এক গাদা শালুক রক্তকম্বল তুলে মন্দিরে ফিরে ওদের পায় নি। খোঁজ ক'রে সারখেলদের বাড়ী গিয়ে থমকে গিয়েছিল। নিরু কাঁদছে, উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। মাসী বিব্রত হয়ে বলছে—ওরে না? বিয়ে বললেই বিয়ে হয় না। মেয়ে থাকলে ছেলে থাকলে বলে। নিরু।

নিরু শোনে নি। সে বলেছিল—না খুড়ীমা, এখান থেকে চল। না।

সারখেলরা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে নিরুর সঙ্গে ওদের ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল। ছেলেটির ঠাকুমা অশ্লীল কথা বলে ঠাট্টা করেছিল নিরুকে। মাসীকে বলেছিল—টাকা আমাদের মেলা। কত টাকা চাই বল? আমার নাতি ক্ষেপেছে। তা ক্ষেপবার কথাই। বলে আজ রেতেই বিয়ে হোক।

নারান অবাক হয়ে গিয়েছিল মেয়েটির জেদ দেখে—শক্তি দেখে। মাসী চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তার সঙ্গে লক্ষ্মী। হৃদয় থেকে গিয়েছিল, কিন্তু সে কটু কথা বলেছিল নিরুকে মাসীকে দু'জনকেই। বলেছিল—আমার মেয়ে হ'লে চাবকে দিতাম।

নিরু ফোঁস করে বলে উঠেছিল—মারুন তো। দেখি। বড় লোকসান হল, না? কত টাকা দালালী পেতেন? আমি বিক্রী হ'তে এসেছি?

মাসী বলেছিল—চল—চল—মা—চল! লক্ষ্মী-মা, আমরা বরং নারানকে নিয়ে চলে যাই। বুঝেছ? আপনারা যেন কিছু মনে করবেন না।

লক্ষ্মী অগত্যা উঠে এসেছিল। বাড়ীতে এসেও নিরু খেতে চায় নি। জেদ ধরেছিল। চলে যাবে সে এখান থেকেও। বহু কষ্টে নিরস্ত করেছিল মাসী। নারান অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মনের সম্ভ্রম আরও বেড়ে গিয়েছিল।

রাত্রে এসে হৃদয় আর একদফা গালাগাল করেছিল। নিরুকে মাসীকে দুজনকেই। মাসীকে বলেছিল—মাসী আমার! নিজের গরজে বোনঝির বাড়ী এসে তার সংসার ভাঙবার চেষ্টা।

মাসী বলেছিল—হৃদয়, এ কি বলছ বাবা?

ঠিক বলছি। আপনি বলেন নি লক্ষ্মীকে, নারানকে পড়াস না কেন?

—সে কি অন্যায় বলেছি ?

—খুব ন্যায় বলেছেন। আবার জমি জেরাতের হিসেব নিয়েছেন। একটা ভাগ্‌ড়া ছেলের খেতে পরতে কত লাগে জানেন ?

—জানি বই কি। কিন্তু ওই সম্পত্তি থেকেই তো আমার বাবার চলেছে। ওর বাবার চলেছে। ওরও চলা উচিত।

হৃদয় বলেছিল এবার—সে সব আর নেই। জমিদার নিলেম করেছে। বিঘে তিনেক ব্রহ্মত্র ছিল তাই আছে। তাও ইন্দ্রপ্রসাদী, মেঘের জল ভেঙ্গে চাষ হলে ধান হয়, নইলে হয় না।

মাসী বলেছিল—তা তো আমি জানতাম না বাবা। লক্ষ্মী আমাকে বলেছিল—জমি জেরাত সবই আছে।

চুপ করে গিয়েছিল মাসী।

নারান খবরটা প্রথম শুনেছিল।

কেমন একটা ধাক্কা খেয়েছিল। জমি সে ভালবাসে। হৃদয়ের জমিতে সে খাটে। তাই জমি নেই, বিক্রী হয়ে গেছে শুনে ভারী দুঃখ পেয়েছিল।

জমি নিলেম করে নিয়েছে ?

হৃদয়ের এখানে বড় হয়েছে, জমিদারের সঙ্গে তার কোন কারবার কোন দিন করতে হয়নি। তবু উনিশশো পঁয়ত্রিশ সাল—এই সময়ের জল বাতাস থেকে জমিদার-বিরূপতা তার মনে বুকে বাসা গেড়ে বসে আছে সেটা সে জানতে পারেনি, আজ প্রথম জানলে।

হৃদয়ের উপর রাগ হল। প্রথম রাগ মাসীকে আর ওই মেয়েটিকে গালিগালাজের জন্যে। দ্বিতীয় তার জমি হৃদয় নিলেম করিয়ে দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা পর্দা যেন উঠে গেল। রাগ হল নিজের উপর। সে মূর্খ—সে বোকা—সে গর্দভ। নিলাম হয়ে গেলে জমির ধান সেই সমান আসছে কেন ? বোকা মূর্খ না হলে এতদিন ধান আনবার সময় সে যখন যেতে চেয়েছে ঘাটবলরামপুরে তখনই হৃদয় বারণ করেছে, তা সে শুনেছে কেন ?

—নারান !

মাসী নিচে থেকে নেমে এসে ডেকেছিল—নারান !

নারান বারান্দায় শোয় নি। ঘরে লক্ষ্মীর সঙ্গে ঝগড়া করছিল হৃদয়। লক্ষ্মী বারবার জিজ্ঞাসা করছিল—সত্যি ? জমি নিলেম হয়েছে ?

দু একবার জবাব দিয়েছিল হৃদয়। তারপর আর দেয় নি।

—বল সত্যি !

—জানি না। ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নে, ঘুমুতে দে।

নারান উঠে গিয়ে বাড়ীর বাইরে গাড়ীর ওপর শুয়েছিল। মাসীর ডাকে উঠে এসে বলেছিল—ডাকছ মাসী ?

—হ্যাঁ—বাবা। খুব ভোরে একটা বাস ছাড়ে বলছিলি—সেটাই আমাকে ধরিয়ে দিয়ে আয়। আমরা বরং ওখানেই বসে থাকব। নিরু তো কাঁদছেই কাঁদছেই। আমার প্রাণটাও ছাড়-ছাড় করছে।

হাঁপাচ্ছিল মাসী। হাঁপানি উঠেছিল।

নারান বলেছিল—চল মাসী। তাই চল। তারও খুব অস্বস্তি লাগছিল।

রামের গাড়ী। হৃদয়ের নয়। হৃদয়ের গরু দুটো বুড়ো এবং রোগা বলে নারান পছন্দ করে না। প্রাণপণে সেবা ক'রে, চরিয়েও ও দুটোকে শক্ত সবল করা যায় নি। চাষের সময় ওতে চাষ চলত হৃদয়ের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। হাজার বলেও হৃদয়কে নতুন তাজা কাঁচা বয়সের গরু কেউ কেনাতে পারে নি। তাই মাসীকে আনবার জন্যে রামের মোষের গাড়ী চেয়ে নিয়েছিল। তার নিজের মাসী তো! রামের ঘরে গিয়ে রামকে ডেকে বলে মোষ দুটো নিয়ে এসেছিল নারান। তারপর ডেকেছিল—মাসী, গাড়ী তৈরী! এস।

সর্বাগ্রে নেমে এসেছিল নিরু। তার হাতে স্যুটকেসটা। মাসীর হাতে আসবার সময় ছিল মিহিদানার চ্যাঙাড়ি। এবার ওষুধের পোঁটলা। আশীর্বাদী।

নিচের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মাসী ডেকেছিল—লক্ষ্মী! ওরে আমরা যাচ্ছি। বাবা হৃদয়!

হৃদয় ওঠে নি। লক্ষ্মী দরজা খুলে বাইরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

মাসী বলেছিল—আমি যাচ্ছি রে। তোরা যেন কিছু মনে করিস নে। জামাইকে বলিস। কেমন?

ঘাড় নেড়ে ইশারায় লক্ষ্মী জানিয়েছিল, বলবে। আঁচলের খুঁটে সে চোখও মুছেছিল।

এখানে গাড়ীর মুখের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল নিরু। সে বলছিল নারানকে—নারানদা, তুমি যে কি উপকার করলে! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু এ কি দেশ তোমাদের! এক তোমাকে দেখলাম ভাল, তুমি ভারি ভাল। সুখী হও—ভাল হও তুমি। এখানে থেকো না তুমি। চলে যেয়ো। নইলে তুমিও এমনি হয়ে যাবে।

নারান জবাব দিতে পারে নি। সে চুপ করেই দাঁড়িয়ে ছিল। নইলে বলত—মন্দই শুধু নেই নিরু। ভাল আছে। হৃদয় জামাই দু-চারজনই থাকে।

—আর এক গ্লাস জল খাব। বড় গ্লাসে। একটু জল দেন। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। বললে নারান।

দেখলাম নারান বদলে গেছে। মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখের কোটর হতে রক্তের ঢেলার মত চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। হাত দুটো যেন মুঠোয় আবদ্ধ।

ডাকলাম—নারান!

মুখ তুলে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—ভুল বলেছিলাম। মানুষের চেয়ে হিংস্র—

ভয়ঙ্কর কেউ নেই। সাপও নয় বাঘও নয়। আমার মধ্যে, আপনার মধ্যে—সবার মধ্যে আছে। পরাধীনতা স্বাধীনতা—কিছুতেই প্রকৃতি বদলায় না। বদলায়নি। ব্যর্থ হয়ে গেছে। গান্ধীজী ব্যর্থ, নেতাজী ব্যর্থ—সব ব্যর্থ। পুণ্য মিথ্যে, শান্তি মিথ্যে। সত্য ওসব বোকার কাছে। মূর্খের কাছে। যতদিন বোকা মূর্খ ছিলাম—।

ধীরেন জল আনলে। বললে—জল।

সে জলের ঘটিটা নিয়ে সর্বাগ্রে মাথায় ঢাললে খানিকটা। মুখে চোখে দিলে। তারপর ঘটি তুলে আলগোছে জল খেয়ে ঘটিটা রেখে বললে—সব বিশ্বাস টুটে গিয়েছে আমার। ওঃ! কুটিল কুৎসিত বীভৎস পৃথিবী। ভয়ঙ্কর পৃথিবী। আমি ভুল বলেছিলাম নিরুকে সেদিন। আমি গড়তে চেয়েছিলাম—ভাল মানুষ—ভাল দেশ। কিন্তু সব মিথ্যে হয়ে গেল। সব! অভিসম্পাতে কিছু হয় না। তবু আর তো কোন অস্ত্র নেই আমার!

বললাম—চুপ কর। শান্ত হও।

সে বললে—শান্ত! অক্ষমের শান্ত হওয়া ছাড়া উপায় কি? হাসলে।

উঠে পড়ল সে। পাক কয়েক পায়চারি করে ফিরে এসে বসল। তারপর বললে—সেই নম্র মৃদু শান্ত কণ্ঠ। বললে—মধ্যে মধ্যে হয়। তারপর শুনুন।

* * *

সমস্ত পৃথিবীই এমনি। তবু আমার দেশের তুলনা নেই। কারও বুক অক্ষত নেই। দগ্ দগ্ করছে ক্ষত। আর একদল মানুষ অর্থ আর প্রতিপত্তির জোরে—কলিজার দাঁত বসিয়ে রক্ত চুষে খাচ্ছে। সম্পদকে লক্ষ্মী কে বলে জানি না। সেই, সেই সব করায়।

হৃদয় জামাই—হয়তো অমানুষ পশু ছিল না। হল আমার সম্পত্তির স্বাদ পেয়ে। আমার জমির ধান তাকে লোভালে। প্রলুব্ধ করলে।

আপনার বন্ধুর—দুইপুরুষের মুটু মোক্তারের প্রথম বড়লোক হয়ে অমানুষ হওয়াটা সত্য। কিন্তু আবার মানুষ হওয়া, সে মরণের সময়েও—সত্যি নয়।

যাক্!

মাসীকে বাসে তুলে দিলাম। মাসী যাবার সময় বললে—নারান তুই একটু লেখাপড়া শেখ রে! সংসারে বাঁচতে হবে। বুঝতে হবে। অন্তত কিছুটা শেখ।

নিরু বললে—তুমি এখানে থেকো না নারানদা। চলে যেয়ো। লেখাপড়া শিখো। আচ্ছা—তোমার লজ্জা করে না—ওই বাড়ীতে থাকতে? ওই ভল্লাদের সঙ্গে বেড়াতে, মিশতে?

মাসী ধমক দিলেন—নিরু!

—নারানদা মন্দ কিছু করেনি। ওকে ভাল লাগল বলেই বলছি খুড়ীমা।

নারান কিছু বলেনি। বাসে ওদের চড়িয়ে দিয়ে ফিরে—ভল্লাদের বাড়ীতে গাড়ী রেখে—মোষ জোড়াটাকে বেঁধে—খড় কেটে দিচ্ছে—এমন সময়—সে চীৎকার শুনতে পেলে। হৃদয় চেঁচাচ্ছে—হারামজাদী, জুতোর বাড়িতে তোর মুখ আমি ভেঙে দেব!

লক্ষ্মীকে বকছে। লক্ষ্মীর কথা শুনতে পেলে না। হৃদয়ের কথা শুনতে পেলে—এই নে—এই নে—এই নে।

এবার দিদি চীৎকার করে উঠল। হাতের কাস্তেখানা ফেলে দিয়ে সে ছুটে গেল বাড়ীর দিকে। সামনেই দাওয়ার উপর দিদি পড়ে গেছে কাত হয়ে—আর হৃদয় তার জুতোটা দিয়ে তাকে আতালি-পাতালি পিটুচ্ছে। আর আস্ফালন করেছে—ধর্ম শেখাও তুমি, আমাকে ধর্ম শেখাও!

আবার সে জুতো তুললে।

অকস্মাৎ কি হয়ে গেল বাবু, নারানের। হ্যাঁ, কি হয়ে গেল। দিদিকে তার প্রথম মারেনি হৃদয়, প্রথম গাল দেয়নি, অনেক মার সে দেখেছে—কিন্তু আজ তার কি হয়ে গেল। —এ-ই—! বলে সে একটা চীৎকার করে উঠল।

তার নিজের কাছেও এমন চীৎকার নতুন মনে হল। নিজেই চমকে উঠল। হৃদয় জামাই ঘুরে তাকে দেখে—ওই জুতোটা হাতে নিয়েই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল উঠোনে—মারবে সে নারানকে। মুখে সেও চীৎকার করছিল—হারামজাদা শূয়োর কি বাচ্চা—আমাকে—

কথা তার শেষ হল না—নারান তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চৌদ্দ বছরের নারানের গায়ে এত জোর—হৃদয় জানত না—নারানও জানত না। তার ধাক্কায় হৃদয় আছাড় খেয়ে পড়ে গেল উঠোনে চিত্ হয়ে। নারান তার মুখে কপালে—ঘুষি কিল মেরে—উঠে দাঁড়াল। লক্ষ্মী তখন উঠেছে—অর্ধ উলঙ্গ সে। চীৎকার করছে—ওরে শত্রু রে! ওরে দোষমন রে! ওরে শয়তান রে। ছাড়—ছাড়—ছাড়। মরে যা! মরে যা! মরে যা তুই! মরে যা।

নারানের জীবনে রাগ বোধ হয় সেই প্রথম। রাগেরও কম বেশী আছে বাবু। আগে রাগ হয়েছে আবার তখনই পড়ে এসেছে। একটু পরেই হেসেছে—ভুলেছে। তখন পর্যন্ত হয়তো নারান ছেলেমানুষ ছিল। ছেলেমানুষের যে ভুলবার ক্ষমতা থাকে—সেটাই' হ'ল মানুষের খেলার বয়েসের ভাব। পরমহংসদেবের একটা গান আছে 'মা, আমারে দয়া করে শিশুর মতন করে রেখো'!

নারানের সেই দিন শৈশব ঘুচল। সব পাল্টে গেল। আগের কাল হলে দিদির পায়ে পড়ত—জামাই-দার পা ধরে কাঁদত। জামাই দাদা মারত—সে মুখ বুজে সয়ে যেত। মারা শেষ হলে—দাঁতে দাঁত টিপে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে—সয়ে নেওয়াটা পুরোমাত্রায় হয়ে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বলত—বাবাঃ বাঁচলাম। কিন্তু সেদিন আর তা' হল না। রাগ তার কিছুতেই পড়ল না। সে দিদিকে বলেছিল—আমি মরব আর তুমি বেঁচে থাকবে? সুখ করবে? তার চেয়ে তুমি মর! আমি সহজে মরব না। ওই হৃদয় মরুক।

প্রচণ্ড ক্রোধ—কিন্তু তার মধ্যেও খোকার নাম সে বলতে পারে নি।

দিদি বলেছিল—বেরিয়ে যা—তু বেরিয়ে যা। এখুনি বেরিয়ে যা। সে তখন হৃদয়কে ধরে তুলছে। হৃদয় উঠে বসে মাথাটা ধরে বলছে—জল, মাথায় জল!

দিদি বলেছিল—জল আন!

সে বলেছিল—না। পারব না।

দিদি পাগলের মত উঠে—আগে ছুটে এসে—তার গালে মেরেছিল একচড়। তারপর বলেছিল—চলে যা—তুই চলে যা। বলতে বলতেই জল আনতে ছুটেছিল। জল এনে স্বামীর মাথায় ঢেলে—মুখে চোখে ছিটে দিয়ে বলেছিল—আর দোব?

—না।—আমাকে ধর। লক্ষ্মীর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। নারান সে দৃষ্টির সম্মুখে কঠিনতর হয়ে উঠেছিল। নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠেছিল। ঘৃণার-ক্রোধের-হিংসার আর অন্ত ছিল না,—মনে—দৃষ্টিতে—দেহের ভঙ্গিতে, সব কিছুতে।

ভয় পেয়েছিল হৃদয়। কিম্বা চতুর হৃদয় গণৎকারে যেমন লগ্ন বিচার করে অঙ্ক কষে, ঠিক সেইভাবে লগ্নটিকে আবিষ্কার করেছিল তাকে তাড়াবার—তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার। বুদ্ধিমান—খুব বুদ্ধিমান হৃদয়। লম্বা ঢ্যাঙা—রোগা হৃদয়—যাত্রাদলে শকুনির পার্ট করত। শকুনিরা ভীম অর্জুনকে ভয় করে—তাদের রোষে পড়ে না। শকুনি মরে সহদেবের হাতে। সে বুঝেছিল—নারানকে সে চিনতে পারেনি।

রাজা পরীক্ষিৎ—একটা ফলের মধ্যে একটা পোকা দেখে সেটাকে পোকাই ভেবেছিলেন। সেটাকে তক্ষক বলে চিনতে পারেন নি।

হৃদয় চিনেছিল। সে জন্তু। চালাক জন্তু—যারা ঠিক বুঝতে পারে প্রতিপক্ষ মানুষ হলেও কত ভয়ঙ্কর। তারা পিছোয়। পিছোয় না—বাঘ। তার শক্তি আছে আর দন্ত আছে। সতর্ক সে বটে। কিন্তু সামনা-সামনি হলে কি মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিলে—হাঁক দিয়ে—ডেকে সে আক্রমণ করে।

বাঘ পরে দেখেছে, নারান তার সঙ্গে লড়েছে। সেদিন হৃদয় চতুর জন্তুর মতো বুঝতে পেরেছিল—এই মানুষের বাচ্চাটা যখন রুখে দাঁড়িয়েছে, তখন ওর চোখে বুকে সর্বনাশের নেশা জেগেছে। মরতে ভয় ওর নেই। শক্তিতে ওকে হারানো যাবে না। সুতরাং মরতে হবে।

দাওয়ায় শুয়ে সে বলেছিল—ওর কি আছে দিয়ে দাও, ও চলে যাক। এখুনি।

দিদি বলেছিল—তুই যদি এখুনি না যাস—তবে আমার রক্তে তুই পা ধুবি। তোর পায়ে মাথা ঠুকে—মাথা ফাটাব আমি।

নারান কোন উত্তর করেনি। বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ী থেকে। শুধু বাড়ী থেকে নয়, গ্রাম থেকে। রামদের পাড়া পর্যন্ত ঢোকেনি। পরনে একখানা কাপড় আর গায়ে একটা গেঞ্জি ছিল। মাথায় গামছাখানা বাঁধা ছিল—গাড়োয়ানদের মত। জামা ছিল তার একটা। সে পরত না জামা। গেঞ্জিও পরত না, পরেছিল কেবল মাসীর সঙ্গে গিয়েছিল বলে। ছাড়ার অবকাশ হয়নি। পায়ে ছিল হৃদয়ের পুরনো একজোড়া স্যাণ্ডেল। সেটা ফেলে দিয়েছিল খুলে, ছুঁড়ে। সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে দশটা টাকা—বোধ হয় তার ভাগ্যবিধাতা আগে থেকে সংস্থান ক'রে দিয়েছিলেন।

সে বললে—বলতে ভুলেছি, নিরু যখন বলেছিল—তোমাদের এ কি দেশ! দম বন্ধ হয়ে

আসছিল আমার। এক দেখলাম তোমাকে ভাল। তুমি মূর্খ হলেও ভাল। এখানে থেকো না তুমি, চলে যেয়ো—নইলে তুমিও শেষে এমনি হয়ে যাবে। সেই সময়ই, না সে সময়ও না। তারপরও ক'টা কথা হয়েছিল মাসীর সঙ্গে। মাসী বাসে উঠবার সময় তার পেটের আঁচলের খুঁট খুলে একখানা দশটাকার নোট বের ক'রে তাকে দিয়েছিলেন।—এটা রাখ বাবা নারান।

নারান আশ্চর্য হয়ে বলেছিল—এ যে দশটাকার নোট মাসী!

—তা হোক রে! তুই রাখ। নিজের কাছে রাখিস। কাউকে দিসনে। দিদিকেও না। সব বুঝতে পারছি রে তোর অবস্থা। তুই—নিরু মিছে বলেনি, বাড়িয়ে বলেনি—বড় ভাল। ভালমানুষ বোকা হয়। রাখ।

—না মাসী।

—না নয়। ধর। তুই আমাদের নিয়ে গেছিস—কলেশনাথতলা নিয়ে গেছিস—নিয়ে এসেছিস—আবার নিয়ে এলি। গাড়ী ভাড়া লাগলে কত লাগত? নে ধর!

পুতুলের মতই নিয়েছিল নারান।

জানেন?—মানুষ তো! বার কয়েক সে নোটখানা দেখেছিল পথে। তারপর কাছার খুঁটে বেঁধেছিল। ইচ্ছে ছিল—মোষ বেঁধে রামের কাছে গচ্ছিত রেখে যাবে। নইলে সে জানত—হৃদয়জামাই ছাড়বে না—উলঙ্গ করে তল্লাস করবে। মনে মনে হিসেবও করেছিল কি ভাবে খরচ করবে টাকাটা। রামকে তিনটে টাকা দেবে। ওর গাড়ী নিয়েছিল। ওকে দিতে হবে। বাকীটা রেখে দেবে। সামনেই চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজনের মেলা। মেলা থেকে বীরেনকে একটা খেলনা কিনে এনে দেবে। বীরেন তার ভাগ্নে। দিদির ছেলে। বীরেন নাম নারানই রেখেছিল। বীরেন্দ্র নামটা ওর খুব ভাল লাগত। এসব ভাবতে ভাবতে এসে—মোষ বেঁধে খড় কাটতে গিয়ে—ভাবনার ছন্দ কেটে গিয়েছিল—হৃদয়ের ওই কুৎসিত গাল শুনে আর দিদির চীৎকার শুনে। রামকে ডেকে টাকাটা গচ্ছিত রাখা আর হয়নি।

ওই টাকাটার কথা মনে পড়েছিল। নদীর ঘাটে এসে। সঙ্গে সঙ্গে বুকে বল পেয়েছিল একটা। নেমে পড়েছিল নদীর ঘাটের বালিতে। আর ফিরে তাকায়নি। নদীর বালি—এক হাঁটু জল পার হয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করেছিল। এসে নদীর ধারে ওপার পানে চেয়ে কতক্ষণ বসে ছিল তার হিসেব ছিল না নারানের। বাসের হর্নে তার চমক ভেঙেছিল।

বাস স্ট্যাণ্ডে তখন বাসখানা—পাঁচ মাইল দূরের স্টেশনে যাত্রী পৌঁছে দিয়ে যাত্রী নিয়ে আবার ফিরে এসেছে। ঘণ্টা দুয়েক পর আবার ছাড়বে। পাঁচ মাইলের চার মাইল বাসে গিয়ে নেমে—পূর্ব দিকে পথ ভাঙলে—তিন মাইল পথ। মাঠের পথে—সবসুদ্ধ চার-পাঁচ মাইল। ট্রেনে চড়ে একটা স্টেশন গেলে—দু মাইল পথ। যাবে? বাসে উঠবে? না। দশ টাকার কিছু খরচ করবে না সে পথ-হাঁটা বাঁচাবার জন্য। তবে—খেতে হবে। বাস

স্ট্যাণ্ডে সেই ক্লীনারকে বলে দশ টাকার নোটটা ভাঙিয়ে নিয়েছিল।

নারানের আজও মনে আছে—একখানা পাঁচ টাকার নোট নিয়েছিল। সঙ্গে চারটে টাকা, এক টাকার খুচরো।

অন্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ—গল্পে শেয়ালটা অতি হিসেবের জন্যে মরেছিল। নারান মরে নি। সে বেঁচেছিল। চার পয়সার মুড়ি আর গুড় কিনে ভিজিয়ে খেয়েছিল এক পেট।

তখন উনিশশো পঁয়ত্রিশ সাল—জিনিসপত্র সস্তা ছিল—অনেক—অনেক সস্তা।—চার পয়সায় সত্যিই এক পেট খেয়েছিল সে।

রাম ভল্লা গল্প করে—ছেলেবেলায় তারা দুই ভাই মিলে চার পয়সা নিয়ে গাজনের মেলায় গিয়েছিল। এক পয়সায় দুটো মণ্ডা আর তিন পয়সার মুড়কী কিনে দুই ভাই পেট ভরে খেয়ে শেষ করতে পারেনি। একটা কুকুর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল—বাকীটা তাকে দিয়েছিল। সেটারও পেট ভরেছিল।

শুনে সকালে হাসে, রামকে ঠাট্টা করে। রাম বলে—ঈশ্বরের দিব্যি।

নারানও ঈশ্বরের দিব্যি করতে পারে।

মাঠের পথই সে ধরেছিল। পথ ঠিক জানে না; তবে তার একটা নিশানা আছে। একটা বিল। কোপাই নদীর মুখে—একটা বিল। বিখ্যাত প্রকাণ্ড বিল। বিলকে বাঁ পাশে রেখে গেলে পড়বে নদী—নদী পার হয়েই ঘাটবলরামপুর। গ্রামের প্রথমেই তাদের বাড়ী।

বিল বহু দূর থেকে নিশানা দেয়। সামনে চেয়ো না—আকাশ পানে চেয়ো, কথা আছে। নারানও তাই চলেছিল।

এক সময় দিগন্তহীন মাঠে দাঁড়িয়ে তার চোখে পড়েছিল—আকাশে হাজারে হাজারে পাখী—ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে।

ছেলেবেলায় দেখেছে এ পাখীওড়া। এতকাল পর—ছ বছর পর নতুন লাগল। সুন্দর লাগল। সামনে তাকালে সে। হ্যাঁ—ওই দূর জল চিক চিক করছে রৌদ্রের ছটায়। মধ্যে মধ্যে আলোর ঝিকিমিকি যেন এঁকে বেঁকে কেঁপে—ছুটে চলে যাচ্ছে। আবার একটা ঝিকিমিকি উঠছে—সেটাও ছুটছে। কোনটা পিছু পিছু। কোনটা ডাইনে—কোনটা বাঁয়ে। বাতাসের খেলা—সে কথা নারান খুব ভাল করে জানে। নদী মাটি—গাছ লতা—এদের সঙ্গে তার মিতালি কতকাল থেকে। দাঁড়িয়ে দেখছিল সে।

আকাশে মুঠো মুঠো অপরাজিতা আর সাদা টগর ছড়িয়ে দিয়েছে। ভেসে বেড়াচ্ছে।

পাখী। সাদাগুলো বড় হাঁস। কালোগুলো সরালি—আরও অন্য জাতের। আশ্চর্য ভাল লাগল তার এই সমস্ত কিছুকে। এত পাখী ওখানে ছিল না। কত পাখী, কত ডাক। কত জল। জলের মধ্যে আলো আকাশ। চারিপাশে মাঠ। আহাহা!

হঠাৎ একটা উৎকট কঠিন শব্দে সে চমকে উঠল। শব্দটা ছুটে চলে যাচ্ছে চারিপাশে। দূর দূরান্তর। কিন্তু কিসের শব্দ। এমন কঠিন শক্ত শব্দ, মন চমকে ওঠে। ও বন্দুক। ওঃ। ওই যে আকাশ থেকে পড়ছে ওই পাখীগুলোর ঝাঁক থেকে—পাখী পড়ছে মাটির দিকে।

কে রে? ওঃ, ওই মানুষগুলো কি?—পাষণ্ড, লোভী, নিষ্ঠুর। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তার ইচ্ছে হয়েছিল—এখানে সে থাকবে—আর এই পাখী কাউকে মারতে দেবে না। তারপর সে বিলের জলে নেমে স্নান করেছিল। গামছা পরে অনেকক্ষণ বসে থেকে কাপড়খানা শুকিয়ে নিয়ে আবার রওনা হয়েছিল গ্রামের দিকে।

নারান বললে—সেদিন সব পরিচয় জানা হয়নি নারানের। প্রতীক্ষা করেছিল। নারান গ্রামে এসে পৌঁচেছিল—বেলা তখন তিন প্রহর পার হয়েছে। একটা ট্রেনের শব্দ আসছিল দূর থেকে। খুব দূর নয়; স্টেশনটা দু মাইল হলেও একটা বাঁক আছে লাইনের, সেটা এক মাইলের মধ্যে। সে ট্রেনটা আজও আছে। এই যেটাকে তিনটের ট্রেন বলে। যায় সাড়ে তিনটের সময়। ঘাট থেকে উঠে বাড়ী চিনতে তার ভুল হয়নি। চালে খড় নামে মাত্র আছে। দেওয়ালের মাথা চালের নিচেই অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। দরজা নেই। জানালা নেই। উঠোনের চারিপাশে পাঁচিল নেই। উঠোনে জঙ্গল জমেছে। দাওয়া ভাঙাচোরা, খুঁটি চারটের মধ্যে একটা নেই, একটা মচকে গেছে। ঘাস ঠেলে সে সেই ভাঙা দাওয়ায় উঠে পলেস্তরা খসা রূঢ় দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে বসল।

তার নিজের বাড়ী! মাসীকে আর নিরুকে মনে পড়েছিল। একখানা চিঠি লিখবে সে—সে চলে এসেছে। তোমাদের কথা রেখেছে। চলে সে এসেছে। সত্যিই খুব ভাল লাগছে। হোক ভাঙা-ভগ্ন; খুব ভাল লাগছে। খুব ভাল জায়গা। সুন্দর বিল। সুন্দর মাঠ। সব সুন্দর।

তিন

জানেন! নারান বললে—নিজের এই বোধটার মধ্যে ভালবাসা আছে। দেশটা সত্যিই সুন্দর। খুব সুন্দর। ওই বিলটা হল—ওই অঞ্চলের বুকের তক্তির মত, কালচে একটা ঝকমকে বড় পাথর বসানো তক্তির মত। হাঁসগুলো যখন বসে থাকে তখন মনে হয় কুচি কুচি সাদা কালো পাথর বসানো তার উপর। ছোট নদী। গাছ-পালা—হৃদয়ের দেশ থেকে কম। হৃদয়ের ওখানকার মাটি এখান থেকে ভাল। ওদের নদীতে কুমীর নাই। এখানে কুমীর আছে। আপনি বা অন্য লোকে কোন্ জায়গাকে ভাল বললেন জানি না। কিন্তু নারানের মনে হল তার এই অঞ্চল ও অঞ্চল থেকে ভাল, সুন্দর।

মানুষগুলিকেও খুব ভাল লাগল। খুব ভাল। প্রথম দিনই সে বসেছিল সেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে, অনেক পথ হেঁটে ক্লান্তিতে একটু ঘুম এসেছিল। হঠাৎ কেউ ডেকেছিল—কে ওখানে বসে গো? শুনছ? ওহে!

সে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছিল—একজন পঁচিশ-তিরিশ বছরের কালো জোয়ানকে। তার হাতে একটা হুঁকো। কাঁধে গামছা। বাড়ীর সামনে উঠোনের ওপাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে। সে বলেছিল—আমি। আমার নাম নারান।

—নারান? কোন্ নারান?

—নারান গোসাঁই। এ বাড়ী আমার। আমার বাবার—

—তুমি গোসাঁই মশায়ের ছেলে?

—হ্যাঁ।

—কি আশ্চর্যি। এলে কখন গো? এ্যাঁ তুমি তো কখনও এস না।

—আমি এসেছি। আমি এখানে থাকব।

—থাকবে কি গো? রাগ করে পালিয়ে এসেছ?

—আর আমি কখনও সেখানে যাব না।

একটু চুপ করে থেকে লোকটি বলেছিল—সে তো ভাল কথা। তা ওখানে ব'সে কি করছ? খেয়েছ কিছু?

—খেয়েছি।

—না মুখ শুকিয়ে রয়েছে তোমার। এস-এস, উঠে এস, আমার বাড়ীতে এস। আমরা মোড়লরা। তোমার বাবার যজমান। আমার নাম বিপিন মোড়ল। এস—এস। ঘরে সাপ-খোপ-ইঁদুর-বিছের বাসা হয়েছে। থাকলে আমরাই সব করে দোব। এখন আমার বাড়িতে এস। কিছু খাও।

বিপিন মোড়লের বাড়ীর মেয়েরা তাকে যত্নের আর অবধি রাখে নাই। বিপিনের মা বলেছিল, আহা, কি সুন্দর চেহারা হয়েছে ঠাকুরের! যেন বলরাম। কালো হলে কেষ্ট বলতাম।

তাকে খেতে দিয়েছিল চিঁড়ে, দুধ-গুড়, কলা।

বিপিনের বউ চিনি দিতে এসেছিল, শাশুড়ী বলেছিল, না-না-না। নতুন গুড় উঠেছে, তাই দাও। হ্যাঁ বাবা, গুড় খাবে না—চিনি খাবে?

নারান গুড় ভালবাসত। বলেছিল—গুড়ই ভাল।

—এই তো! বামুনের ছেলে! আগে বামুনরা চিনি খেত না। বলত—ম্যাগো, বলত—ঘেন্না লাগে!

—বিপিন বলেছিল—না গো, সে সাদা নুনে। চিনিতে নয়।

—কে জানে বাবা! বলত তো!, তারপর বলেছিল—তা ভাল হল, তুমি এলে। ভিটেটা পড়ে কাঁদছিল। বুঝেছ? আমাদের ভাল হল পুরুত নাই গাঁয়ে। বামুনেরা সব ইস্কুলে পড়ছে। বুড়োদের দেমাক অনেক। তা হ্যাঁ বাবা—পূজো-আর্চা জান তো?

মিথ্যে বলে নি নারান। বলেছিল—না। জানি না। এখনও পৈতে হয় নাই।

—পৈতে হয় নাই! হেই মা! গোঁপ বেরুব-বেরুব করছে! ও বিপিন!

বিপিন বলেছিল—আমরা গাঁয়ে চাঁদা করে পৈতে দিয়ে দেব। এই বৈশাখেই দিয়ে দেব।

খাওয়ার পর বিপিন বলেছিল—চল। গাঁয়ের সব দেখা করে আসবে চল। সে গোটা গাঁ

ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছিল। সবাই—সবাই তাকে সাদরে আহ্বান করেছিল। বলেছিল—এস থাক। ভাবনা কি?

বড়লোক রায়েদের বাড়ীও গিয়েছিল। রায় বুড়ো লোক, চশমা চোখে দিয়ে তাকে দেখে বলেছিল—তাই তো এলে, কিন্তু দেরি করে এলে যে। তোমার ভগ্নিপতি যে সব একরকম শেষ করে দিয়েছে। তা যাক্। বুঝলে বিপিন, একটা কিছু তো করে দিতে হয়। রাঁধতে পারবে? জান রান্নার কাজ?

নারান একটু ধাক্কা খেয়েছিল। রান্না? রাঁধুনী বামুন?

মনে পড়েছিল নিরুকে। সে বলেছিল—না।

বিপিন বলেছিল—পৈতেটা দিয়ে দেন সকলে মিলে। তারপর ওর বাবা আমাদের পুজো-আর্চা করত। তাই করবে।

বুড়ো রায় বলেছিল—পৈতে হয় নি? এ যে গাঁদা মিনষে হয়ে গেছে। তা দাও পৈতে। আমি কিছু দোব।

ওখান থেকে ভট্‌চাজ-বাড়ী গিয়েছিল। তার মনে পড়েছিল বিশুকে। বিশ্ববন্ধু। ছেলেবেলায় দুজনে খুব বন্ধু ছিল। বিশ্ববন্ধুকে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে পরিচয়ের আগেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ববন্ধু দাওয়ার উপর হ্যারিকেনের আলোয় ইংরেজী কবিতা পড়ছিল। সেদিন নারান একটা দুর্বোধ্য ভাষাই শুনেছিল—বুঝতে পারে নি।

বিশু বিপিনের কাছে তার পরিচয় শুনে বলেছিল—নারান! সেই নারান! তুমি নারান?

—হ্যাঁ। ফ্যাল ফ্যাল করে নারান তার পানে তাকিয়েছিল।

বিশু বলেছিল—বোস।

—তুমি কি পড়?

—ক্লাস নাইনে পড়ি।

—ক্লাস নাইন?

—তুমি?

—আমি তো পড়ি না।

—পড় না?

—না।

—সে কি? বড় হয়ে করবে কি?

নারান বলেছিল—চাষ করব। আমি চাষ করতে খুব ভাল পারি।

বিপিন বলেছিল—আর আমাদের পুরুতের কাজ-টাজ করবে।

বিশ্ববন্ধু চুপ করে বসেছিল। বিশ্ববন্ধুর বাবা বেরিয়ে এসে খুব স্নেহ করে বলেছিল—বেশ করেছ। নিজের গাঁয়ে এসেছ, খুব ভাল করেছ। থাক, কোন ভাবনা

নেই। সব হবে।

* * *

সংসারে দুখীরামদেরই হোক আর সুখীরামদেরই হোক—যা হয় তা নিজেরাই করে। সুখীরামরা সবের চেয়েও বেশী করে—তাও নিজেরাই করে। সুখীরামের অল্প যেটুকু হয়—তাও তারা নিজেরাই করে। যা হয় না, তা কিছুটা বুদ্ধিদোষে হয় না—বাকীটা অন্যে হতে দেয় না। এটা নারান বুঝত না তখন, কিন্তু অন্যের উপর ভরসাও সে করেনি। নিজেই করতে শুরু করেছিল, পরদিন সকালেই বিপিনকে বলেছিল—আমাকে একটা কোদাল আর একটা দা' দেবে মোড়ল?

—কি করবে গো?

—উঠানটা পরিষ্কার করব।

হেসেছিল বিপিন।—তুমি পরিষ্কার করবে? পারবে?

—পারব, তুমি দাও।

—উ বেলায়। উ বেলায় আমি পাঁচজনকে জুটিয়ে নিয়ে ক'রে দোব।

হেসে সে বলেছিল—আমি খানিকটা করি—

—তা বেশ নাও। কিন্তু সাবধানে বাপু। দু চারটে সাপ-খোপ থাকবে।

দু চারটে নয়, একটা গোখরা, দুটো চিতি, একটা লাউডগা সে একবেলাতেই মেরেছিল। এবং ওবেলা হতে হতে প্রায় অর্ধেক সে পরিষ্কার করে ফেলেছিল। ঘাস-পাতাগুলো ফেলেছিল একটা গর্তে, সার হবে, ছোট কয়েকটা গাছ ছিল আঁকড়ের আকন্দের—সে-গুলোকে কেটে আলাদা রেখেছিল, শুকুলে জ্বালানি হবে।

সেদিন নেমন্তন্ন করেছিল বিশ্ববন্ধু। সে রাত্রে শুয়েছিল মোড়লের বাড়ীতে। সকালে যখন সে কাজে লেগেছে, তখন বিশ্ববন্ধু নিজে এসেছিল নেমন্তন্ন করতে।

—নারান! তাকে দেখতে পায় নি—দেখতে পেলেও ঘাস-পাতার ধুলোয় মাখা নারানকে চিনতে পারেনি। ভেবেছিল মজুর। নারান ডাক শুনে উঠে দাঁড়াতেই বিশ্ববন্ধু সবিস্ময়ে বলেছিল—তুমি নিজে পরিষ্কার করছ?

—হ্যাঁ। সে হ্যাঁ অত্যন্ত সহজ সাধারণ একটি হ্যাঁ। না তার মধ্যে পৌরুষের অহঙ্কার, না তার মধ্যে ক্ষীণমাত্র মজুরের কাজ করার লজ্জা।

—ওটা কি? সাপ! তখন প্রথম সাপটা মেরেছে নারান।—ও তো লাউডগা। চোখ খেয়ে নেয়।

—হ্যাঁ একটা লাউডগা। আকন্দ গাছটায় জড়িয়েছিল। চোখ খায় না। মিছে কথা। আমি মেরেছি আগে।

—কি ক'রে মারলে? ও তো উড়ে যায়।

—এক ঢেলাতে। লাঠি মেরে মারা যায় না ওগুলো। উড়ে যায় না—লাফায়। সট করে লাফ দেয় এগাছ থেকে ওগাছে। মানুষ বলে ওড়ে। পাখা না থাকলে উড়তে পারে?

তার আপাদমস্তক ভাল ক'রে দেখে বিশ্ববন্ধুর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তার উপর-হাতে হাত দিয়ে বলেছিল—মাসেলগুলো কি শক্ত হয়ে উঠেছে! তোমার গায়ে খুব জোর! না?

এবার বেশ অহঙ্কৃত হয়ে হেসেছিল নারান।

বিশ্ববন্ধু বলেছিল—তুমি আমাদের বাড়ীতে খাবে আজ। মা বললে।

বেলা দুটো নাগাদ সে চান করে খেতে গিয়েছিল। বিশ্ববন্ধু বাড়ী ছিল না। সে কোশখানেক দূরে হিরণহাটির হাইস্কুলে পড়তে যায়। বিশ্ববন্ধুর বাবা তখন খেয়ে শুয়েছে। মা বসে ছিল। তাকে আদর ক'রে খাইয়ে অনেক পুরনো কথা বলেছিল। তার মায়ের কথা। তার ছেলে-বয়সের কথা। তার মায়ের সঙ্গে বিশ্ববন্ধুর মায়ের সই পাতানো ছিল। মনে পড়ে তাকে সইমা বলে ডাকতে শিখিয়েছিল।

সইমা তার সঙ্গে এসে—বাড়ী পরিষ্কার কতটা হয়েছে—কেমন হয়েছে—দেখে গিয়েছিল। এবং দেখে অবাক হয়েছিল। শুধু তাই নয়—তখন দুটো মরা মাঝারি গোখরো পড়ে ছিল এক পাশে, তার সঙ্গে লাউডগাটা আর একটা চিতি দেখে সভয়ে বলেছিল—তুমি মারলে?

হেসে সে বলেছিল—হ্যাঁ।

—ওরে বাপরে!

তখনই বিপিন মাঠ থেকে কলাই কেটে গাড়ী নিয়ে ফিরছে। গাড়ীর উপর থেকেই সে উঠোনটা প্রায় অর্ধেক পরিষ্কার হয়ে গেছে দেখে বলেছিল—বলিহারি বলিহারি বলিহারি! ঠাকুর তো সামাগ্যি লয় মা ঠাকরুণ!

বিশ্ববন্ধুর মা বলেছিল—হাঁ বাবা। দুর্ধর্ষ ছেলে।

* * *

গোসাঁই গল্প বলতে বলতে বন্ধ করে প্রশ্ন করেছিল—আচ্ছা মানুষ দুর্ধর্ষ হয়ে জন্মায়, না দুর্ধর্ষ হয়ে গড়ে ওঠে বলতে পারেন?

একটু ভেবে আমি বলেছিলাম—দুই-ই।

—হ্যাঁ। দুই-ই। দুর্ধর্ষপনা নিয়ে যে না জন্মায় সে অবস্থা-গতিকে খানিকটা দুর্ধর্ষ হয়—তার বেশী হয় না। কামুক কাম নিয়ে জন্মায়, লোভী লোভ নিয়ে জন্মায়, সাপের বিষ নিয়ে জন্মানোর মত।

নারানের কাম ছিল না, লোভ ছিল না, একটা কি ছিল। খুব একটা হৈ হৈ করার, আনন্দ করার এমন একটা কিছু ছিল তার মধ্যে, কোথাও একটু গোলমাল হলেই ছুটে যেত। ভিড় জমলে—ঠেলে ঠুলে 'দেখি'—বলে ঢুকে পড়ত। সকলের আগে গিয়ে দাঁড়াত এমনি একটা কিছু ছিল।

বাহাদুরি দেখানোর একটা স্বভাব। কাঙালপনা থেকে হয়েছিল? না। কাঙালপনা নারানের ছিল না।

হ্যাঁ, দুখীরামরা কাঙাল হয় সুখীরামদের ঐশ্বর্য দেখে, ভীতুও একটু হয় তাদের প্রতাপ দেখে। নারান দুখীরাম হলেও দুটোর একটাও তার মধ্যে ছিল না।

তারপর হেসে গোসাঁই বলেছিল—যাক গে। কি হবে সে হিসেব করে? নারানের হিসেব ছিল না—এইটেই নারানের হিসেব।

দুদিন পর। ঠিক দুদিন পর।

নারানের উঠোনটা পরিষ্কার হয়ে গেছে—সে মাটি কেটে জল দিয়ে কাদা করে পায়ে পায়ে হাঁটছে, তার সঙ্গে বেনাঘাসের কুচি মিশিয়ে দিচ্ছে। এবার সে ঘরের ভাঙা ভগ্ন জায়গাগুলিতে মাটি ধরাবে। যে সব জায়গা একেবারে ছেড়ে ভেঙে পড়েছে, সেসব জায়গা বেশ ভাল করে ভেঙে আবার দেওয়াল দেবে। এমন সময় একটা গোলমাল উঠল।—গেল—গেল—গেল। তার সঙ্গে হেই—হেই—হেই শব্দ।

ছুটে গেল নারান। গ্রামে বেটাছেলে—চাষীরা নেই; আছে ভদ্রলোকেরা—আর দু চারজন বুড়ো আর নারানের মত অল্পবয়সী চাষীর ছেলে। গিয়ে নারান দেখে একটা ষাঁড় একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর শিঙ নেড়ে ফোঁস ফোঁস করছে। গলিটা দুই বাড়ীর মধ্যে পানিপাতনের গলি—আর ও মুখটা পাঁচিল দিয়ে বন্ধ। গলির ভিতর দুটি বউ ষাঁড়টার তাড়া খেয়ে ছুটে ঢুকেছে, খেয়াল হয়নি যে ওমুখ বন্ধ। ষাঁড়টা রায়বাবুদের কার শ্রাদ্ধের ধর্মের ষাঁড়; অত্যন্ত বদমেজাজী—যেমন প্রকাণ্ড শরীর তেমনি দুখানা শিঙ! এর আগে একটা ষাঁড়কে যুদ্ধ করে প্রায় মেরে ফেলেছে। এক চাষীর একটা বলদ সত্যিই মেরেছে। যখন লেজ উঁচু করে রাস্তা দিয়ে ছোটে তখন দশ-বারো জন লাঠি নিয়ে না দাঁড়ালে রোখা যায় না। তখন তারা মারতে মারতে গ্রামছাড়া করে দিয়ে আসে। থাকে সে ওই বিলের ধারে মাঠে, ওখানেই প্রচুর ঘাস এবং ফসল খেয়ে রাজার মত ঘোরে; গ্রামের গরু চরাতে গেলে তাদের মধ্যে ঘোরে। মধ্যে মধ্যে এক একটি গাভী তার সঙ্গিনী হয়—তখন তাকে আর বাড়ী আনে না চাষীরা, আনলে ওই বৃষরাজ সঙ্গে সঙ্গে আসবে। কয়েক দিন মাঠে থেকে গাইটা একদিন আপনিই ফেরে। ষাঁড়টা তখন বিলের অন্য দিকে চলে যায়। হুঙ্কার ছাড়ে। কখনও কখনও ঢুকে পড়ে গ্রামে। সেদিন ওইরকম করে গ্রামে ঢুকেছিল। যারা গ্রামে ঢোকা দেখেছিল—তারা তাড়া দিয়ে তাড়াতে চেয়েছিল—তাতে ফল হয়েছিল উল্টো। সে লেজ তুলে হুঙ্কার ছেড়ে ছুটেছিল তাদের তাড়া করে। তারা পাশে সরে বেঁচেছে। কিন্তু সামনে পড়েছিল বউ দুটি। তারা ঢুকে পড়েছে এই বন্ধ গলিতে। ষাঁড়টা গলিতেই ঢুকতে গিয়েছিল—কিন্তু গলিটা এমন সংকীর্ণ হয়ে গেছে যে সে কিছুটা ঢুকে আর ঢুকতে পারছে না। এদিকে বেরও হবে না। কঠিন আক্রোশে আগলে দাঁড়িয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর শিং নেড়ে ফোঁস ফোঁস করছে।

নানান গবেষণা চলছে। ওদিকে থেকে মই নামিয়ে মেয়েদের তুলতে গিয়েছিল—একটি মেয়ে পড়ে গিয়েছে। হৈ হৈ চলছে। পিছন থেকে এরা যত খুঁচছে তত সে সামনে এগুতে চেষ্টা করছে। নারান এসে দেখেই হিসেব করলে না—নিকেশ করলে না। একবার দেখেই ছুটে বাড়ীর ভিতর গিয়ে এক আঁটি খড় নিয়ে বন্ধ মুখের পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফিয়ে

পড়ল। তারপর তার কোঁচড় থেকে দেশলাই বের করে খানিকটা খড়ে আগুন ধরিয়ে সামনে এগুতে লাগল। এবার ষাঁড়টা পিছু হটল। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগল নারান। জলন্ত খড়ে আরও খড় যোগান দিলে। ষাঁড়টা বোধ হয় এমন করে আগুনের সামনে কখনও পড়েনি। গলি থেকে বেরিয়েই সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। পিছু পিছু নারান। এতক্ষণে পিছনের লোকেরাও যোগ দিল লাঠি নিয়ে। গোটা জনতার উল্লাসের সীমা ছিল না। কিন্তু সব চেয়ে বেশী উল্লাস হয়েছিল নারানের।

লোকে বলেছিল—আচ্ছা বুদ্ধি।

কেউ বলেছিল—ডাকাত ছেলে। কি সাহস।

বিশ্ববন্ধুর মা সেদিন তাকে বলেছিল—এমন অসম সাহস করো না বাবা, কোন্ দিন বিপদ হবে।

নারান বলেছিল—না। অর্থাৎ হবে না।

সেই দিন সে খেয়ে দেয়ে গিয়েছিল হিরণহাটি। থাচ্ছিল ক'দিন বিশ্ববন্ধুর বাড়িতে। বিশ্ববন্ধুর মায়ের সইয়ের ছেলে—তা ছাড়া তিনি এই বিচিত্র ছেলেটিকে দু তিন দিনেই ভালবেসেছিলেন। সকাল থেকে ঘর মেরামত করছিল—তারপর ষাঁড় তাড়িয়ে আর কাজ হয়নি; অপরিমেয় উল্লাসে হেসেছে—নিজে হেসে তৃপ্ত হয়নি—অন্যদের সঙ্গে হেসেছে। তারপরই মনে হয়েছিল—সকাল সকাল স্নান করে খেয়ে—ও বেলায় সকাল সকাল আবার কাজে লাগবে। খেতে বসে শুনেছিল—বিশ্ববন্ধুর বাবা যাবে হরিণহাটি। কাজও আছে, এখানকার লোকের কাজ হিরণহাটিতে প্রায়ই থাকে। হাট বাজার পোষ্টাপিস ইস্কুল ডাক্তার বদ্যি সবই হিরণহাটিতে। বিশ্ববন্ধুর বাবার কাজ—বিশ্ববন্ধু ইস্কুলে পড়ে—সেই করে। আজ কিন্তু নিজেকে যেতে হবে। বিশ্ববন্ধুর মামা বিদেশে চাকরী করেন। তিনি চারটের ট্রেনে এই এই স্টেশন হয়ে দেশে যাবেন। এখান থেকে আরও চারটে স্টেশন পর। সেই বিশ্ববন্ধুর মামা লিখেছেন ভগ্নীপতিকে, স্টেশনে এসে দেখা করতে। কাজও আছে একটু।

বিশ্ববন্ধুর বাবা তাই যাচ্ছেন। তা ছাড়া আজ হাটও বসে। নারানের ইচ্ছে হল সেও যাবে—দেখে আসবে হিরণহাটি। হিরণহাটি প্রায় শহর। বড় বড় পাকা বাড়ী আছে। বাবুদের একটা হাতী আছে। হাতী নারান দেখেনি। শহরও দেখেনি। তা ছাড়া একখানা কাপড় না হলে চলছে না। একখানা কাপড় শুকিয়ে পরায় অনেক কষ্ট। লোক দেখবে। তাতে কেমন লজ্জা হয়। সে চলে যায় বিলে। গামছা পরে কাপড়খানা কেচে পাড়ে মেলে দিয়ে জলে নামে। এক কোমর জল—এক বুক জল—সাঁতার জল—খানিকক্ষণ তোলপাড় করে—হাঁসগুলোকে তেড়ে বেড়িয়ে খেলা করে। পাড়ে মেলে দেওয়া কাপড় খানা শুকুলে তবে ওঠে। পরে গ্রামে ফেরে। তাই ইচ্ছে হল—কাপড়ও একখানা কিনবে। বললে—সইমা—কাকার সঙ্গে আমিও যাব। কাপড় কিনব একখানা।

—টাকা আছে তো রে?

—আছে। ন'টাকা ক'আনা আমার আছে। আর বিড়ির পাতা তামাক সুতো কিনে

আনব। পাকিয়ে বিক্রী করব।

—তুই বাবা অদ্ভুত। তা রায়েরা বলছে রান্নার কাজ করতে পারিস তো কর না। ওদের জামাই বিদেশে থাকে—তার কাছে পাঠাবে।

—না সইমা। উ কাজ আমি করব না।

কেমন করে যে ওই রান্নার কাজটা তার খারাপ মনে হয়েছিল—তা নারান আজও বলতে পারে না। অথচ সেইদিনই সে বিশ্ববন্ধুর বাবার মোট হিরণহাটি থেকে বলরামপুর পর্যন্ত মাথায় বয়ে নিয়ে এসেছিল। বিশ্ববন্ধুর মামা স্টেশনে ভগ্নীপতিকে নতুন কাপড়ে চোপড়ে ভর্তি একটা স্যুটকেস দিয়েছিলেন। নতুন চামড়ার স্যুটকেস। গত পুজোর সময় বিশ্ববন্ধু মামার বাড়ী গিয়ে মামার চামড়ার স্যুটকেস দেখে ভারী মুগ্ধ হয়েছিল। বার বার হাত বুলিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল—কত দাম মামা?

মামা হেসে বলেছিলেন—এবার যদি ফার্স্ট ক্লাসে ওঠো তা হলে একটা স্যুটকেস নতুন কিনে দেব। কথা রইল।

বিশ্ববন্ধু ফার্স্ট হয়েছিল এবং চিঠিও লিখেছিল মাঘ মাসে। মামা লিখেছিলেন—স্যুটকেস নিশ্চয় পাইবে। চৈত্র মাসে বাড়ী আসবার সময় স্যুটকেস নিয়ে এসেছেন—ভর্তি করে। ভগ্নী ভগ্নীপতি ভাগ্নের জন্যে কাপড় জামা বোঝাই করে নিয়েছেন। বিশ্ববন্ধুও সঙ্গে ছিল স্টেশনে। স্যুটকেসটা নিতে গিয়ে বিশ্ববন্ধুর বাবা বলেছিল—এ যে খুব ভারী হে! কি আছে?

বিশ্ববন্ধুর মামা বলেছিল—শিল-নোড়া। দিদির বরাত। বাড়ীতে মির্জাপুরের শিল দেখে বলেছিল—এবার যখন আসবি—আমার জন্যে একটা শিল আনিস ভাই। সুন্দর শিল। সেটাই আছে তলাতে। আর খানকয়েক কাপড়জামা।

বিশ্ববন্ধুর মামা রেলে কাজ করে—থাকে মোগলসরাইয়ে।

ট্রেন চলে গেলে বিশ্ববন্ধুর বাবা বকেছিল স্ত্রীকে—দেখ দেখি, মেয়েদের আহম্মকিটা বোঝ দেখি। এই শিল—নাও এখন কুলী কর। ডাক রে বাবা—কুলী ডাক।

নারান এসে সেটাকে তুলে দেখে বিশ্ববন্ধুকে বলেছিল—দাও—তুলে দাও আমার মাথায়, চলুন কাকা আমি নিয়ে যাই।

—তুমি?

—হ্যাঁ। এই তো এইটুকু পথ। এর চেয়ে আমি আরও বেশি ভারী বইতে পারি। দিদির বাড়ীতে বইতাম।

বিশ্ববন্ধু লজ্জা পেয়েছিল। বিশ্ববন্ধুর বাবা বলেছিল—বেশ তো, তুই-ই নিবি পয়সা ক'টা। চল।

বাড়ী এসে পয়সাও দিতে চেয়েছিলেন—চার আনা। কিন্তু সে নেয়নি। সে মুখ নিচু করে হেসে বলেছিল—না সইমা। নিজের ঘরে পয়সা নেয়? ব'লে পালিয়ে গিয়েছিল ছুটে।

সেদিন রাত্রে খেতে এসে সে বসেছিল—বিশ্ববন্ধুর কাছে। বিশ্ববন্ধু পড়ছিল। সেদিন তার পড়ায় অনুরাগ ছিল খুব গাঢ়। ফার্স্ট হয়ে সে স্যুটকেস পেয়েছে—জামা পেয়েছে। দুটো জামা।

সে বসে শুনছিল।

মনে আছে সেদিন বিশ্ববন্ধু ইতিহাস পড়ছিল। পলাশীর যুদ্ধ। ইংরিজী নয়, বাংলায় পড়ছিল। 'নবাব আলিবর্দীর পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লা মুরশিদাবাদের নবাব হইলেন।' সিরাজউদ্দৌল্লার নাম সে জানে। আর একটা নামও তার চেনা ঠেকেছিল—মীরজাফর। কিন্তু গল্পটা সে জানত না। বিশ্ববন্ধু পড়ে যাচ্ছিল—সে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল।

বিশ্ববন্ধুর মা—তাকে বিশ্ববন্ধুর একটা জামা এনে দিয়ে বলেছিল—নারান, এটা তোমার গায়ে হবে?

জামাটা নতুনই বটে। তবে মামার দেওয়া নয়। সম্ভবতঃ ঘরে ছিল। নিতে দ্বিধা হয়নি নারানের। নিয়ে কিন্তু দেখে বলেছিল—হবে না সইমা। বুকে টান হবে।

—তা হোক না একটু টান।

—তাই হোক। সে পরেছিল। সত্যিই টান হয়েছিল—বেশ টান।

সইমা বলেছিল—নারান—আমার ভাইকে দেখলে।

—দেখলাম। সাহেব লোক।

—হ্যাঁ। রেলে বড় চাকরী করে। এখন কাশীর কাছে আছে। মোগলসরাই মস্ত ইষ্টিশান। ওর সঙ্গে যাবে? বলব ওকে? এখন এটা-সেটা রান্নাবান্না করবে—তারপর একটা চাকরি তোমার রেলেই হয়ে যাবে। তোমার কাকাও বলছিল।

খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলেছিল—না সইমা। এ গাঁ ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। না।

* * *

একই পৃথিবী—বাবু। কিন্তু একই পৃথিবী দিনের আলোয় একরকম, রাত্রের অন্ধকারে আর একরকম। দিনের আলো ফুটতে ফুটতে ফুল ফোটে—পাখীরা কলকল করে গান গায়। মানুষ জাগে, কাজ করে, গান গায়, জল—খালে বিলে নদীতে—আলোর ছটায় ঝিকি-মিকিতে ভরে যায়, কোন ভয় থাকে না। রাত্রে সেই পৃথিবীই আর একরকম। অন্ধকার হতে হতে ফুলগুলো শুকোয়, ঝরে পড়ে, পাখীরা ডালে বাসায় বসে থাকে, চোখে দেখতে পায় না; চুপচাপ। ওই এতবড় বিলটাতে ওই এত পাখী—যারা ওই আকাশের অনেক উঁচুতে ওড়ে—উড়তে পারে, তারা অসহায় হয়ে ভাসে জলের বুকে। জ্যোৎস্না রাত্রে ওরা অবিশ্যি ধানক্ষেতে নামে—ফসল খায়। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে নিঝুম। মানুষ আরও পাল্টায়। সে ঘুমোয়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে। অতৃপ্ত কামনার স্বপ্ন। যারা জেগে থাকে তাদের প্রায় সবাই দুশ্চিন্তায় জেগে থাকে, ক্রোধে জেগে থাকে, হিংসায় জেগে থাকে; আর জেগে থাকে কামে। কাম নিন্দার নয়, তা থেকেই সৃষ্টি—কিন্তু কামার্ত পুরুষ নারী দুইই প্রায়

জন্তু। ওখানে আদিম পৃথিবী। পৃথিবীর বুকে দিনে যারা ঘুমোয় রাত্রে তারা বের হয়। সাপ —শেয়াল জন্তু জানোয়ার—চোর ডাকাত। খুনে—

—ওঃ।

বক্তা গোসাঁই অকস্মাৎ একটা যেন কিছুকে তিরস্কার করে উঠল। তিরস্কার ঠিক নয়। তার মধ্যে আর্তনাদের একটি রেশ আছে। সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন সূচীমুখের মত অতর্কিতে বিদ্ধ করে।

তার দিকে তাকালাম আমি।

গোসাঁই বললে—রাত্রি যে কত ভয়ঙ্কর হয়—। ওঃ।

তারপর তিক্ত হেসে বললে—প্রকৃতির নিয়ম—করবে কি মানুষ। কিন্তু অন্ধকারের সবটাই পাপ নয়, অন্যায় নয়। না। কালীপুজো অন্ধকার রাত্রে। মহাফল মেলে। মহাফল।

বুঝতে পারলাম কি বলছে সে। কিন্তু কথা বলতে হল না। হ্যাঁ, সাহসই হল না।

মহাফল ও পেয়েছে কিনা জানি না। একটা মহামুহূর্তের কথা ওর মনে পড়েছে রাত্রির কথায়—অন্ধকারের কথায়।

আত্মসম্বরণ করে—একটু পর সে বললে—রাত্রে ঝিলের জলটা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যেত। চাঁদ উঠলে চমকাতো। শীতকালে জ্যোৎস্নারাতে কুয়াশা জমত। সে অপরূপ দৃশ্য। সেও তো প্রায় দিনের মত।

প্রথম গিয়ে নারান ওই অঞ্চলটিকে গ্রামকে—দিনের পৃথিবীর চেহারায় দেখেছিল। দেখে সে এমন ভালবেসেছিল যে যেন তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল। মাটি-গাছপালা-বিল-নদী—সব কিছুর সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হয়েছিল তার। তার সঙ্গে মানুষ। এখানকার সবের আগে পরিচয় বিলের সঙ্গে। বিলের থেকে আর কিছু বেশী ভাল লাগেনি। বিলে স্নান সে ছাড়েনি। আর হাঁসের সঙ্গে খেলা। তারপর মানুষ—তারপর মাটি। ঘর গড়তে গিয়ে মাটির পরিচয় পেয়েছিল—ওখানকার মাটিতে বড় বেশী বালি। এখানে বালি কম। মাটির রাগ বড় ভাল। মানুষদেরও ভাল লেগেছিল। বিপিন সব থেকে ভাল। তারপর সইমা, বিশ্ববন্ধু, বিশ্ববন্ধুর বাবা। তারপর আরও সব। রতন মোড়ল, দেবু মোড়ল, বারু মোড়ল, ঘোঁতন নন্দী, ঠানু পাল—এরা সব মোড়লপাড়ার। ভটচাজপাড়ার সনু ভটচাজ, ঝণ্টু ঠাকুর, বাদল চাটুজ্জে, পারু মুখুজ্জে, শিবু রায়, সকলেই বেশ লোক। বড়লোক রায় মশায়ও বেশ লোক। হ্যাঁ, বেশ লোক। তাকে সহজ স্নেহে গ্রহণ করে—প্রথমটা দুদিন চারদিন করে খাওয়ালেন। তারপর বৈশাখ মাসে তার পৈতেও দিয়ে দিলেন। গোপেশ্বর তলায় বিশ্ববন্ধুর বাবাই তার বাপের কাজ করে পৈতে দিয়ে নিয়ে এলেন। দণ্ডী হাতে মাথা নেড়া করে গেরুয়া কাপড় প'রে গ্রামে ফিরল—বিপিনের মা মুখ দেখলে। সোনার আংটি ছাতা জুতো কাপড় জামা থালা গেলাস বাটি, পুজোর বাসন কোশাকুশি দিলে ভিক্ষে—মা। গাঁয়ের মেয়েরা বাড়ী এসে ভিক্ষে দিয়ে গেল। বামুনেরা—তারপর শূদ্ররা। চাল কলা হরিতকী পৈতে—টাকা আধুলি সিকি; সে অনেক। রায়বাড়ী থেকে রাঁধুনি বামনী—সে

রায়েদের নিজের লোক—সে ভিক্ষে দিয়ে গেল—একটা টাকা দিয়েছিল রায়বাড়ী থেকে। সইমা একটা আংটি দিয়েছিল সোনার।

বিশ্ববন্ধু পাশে ছিল—টাকা-রেজগী হিসেব করে সেই গুনেছিল—তিরিশ টাকার উপর হয়েছিল। কলা সে অনেক, তার সঙ্গে বাতাসা, কদমা, আর আতপ চাল—তা আধমণ।

এরপর আর একদফা ব্রহ্মচারী নিমন্ত্রণ। সে খুব পরিপাটি ক'রে খাওয়া। তাতেও চলে গিয়েছিল দেড় মাস। শূদ্ররা সিধে দিয়েছিল।

প্রথম মাস তিনেকের মত এমন উৎসবময় জীবন তার আগেও আসেনি—পরেও না—আর কখনও আসবে না।

ওর জমি, ওর পুকুর নতুন ক'রে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল বিপিন। দিদি কি হৃদয় ওরা পৈতের খবর পেয়েও খোঁজ করেনি। নারানও করেনি। শুধু ভাগ্নে বীরেনের জন্ম মধ্যে মধ্যে মনটা কাঁদত।

কাঁদত সন্ধ্যেবেলা। যে সময়টায় দিনের হৈ-হৈ শেষ হয়েছে—রাতের আসর বসেনি, সেই সময়টা। ও চলে যেত বিলের ধারে। বসে থাকত। মন কাঁদত।

বিলের ধারে যেত তিনবার, একবার ভোরে।

ভোরবেলা হলেই সে উঠে ছুটত। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটত। গিয়েই সে—বিলের ঘাস-বনে লুকনো একটা টিন আর একটা লাঠি নিয়ে—প্রাণপণে পিটত। ঘুম ভাঙিয়ে উড়িয়ে দিত হাঁসগুলোকে? হাঁসগুলি তখন নিথর হয়ে ভেসে থাকত জলের উপর—গলা আর পাখার মধ্যে মুখটা গুঁজে। এই সময়টাই শিকারীদের শিকারের প্রশস্ত সময়। নিশ্চিন্ত ঘুমন্ত হাঁসগুলোর পিছন থেকে জলে জলে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে রেঞ্জের মধ্যে পেলেই গুলি করত।

এরপর বেলা হ'লে হাঁসেরা চলে যেত মাঝখানে—চকিত দৃষ্টি সজাগ রেখে সাঁতার কাটত, খেলত, উড়ত, বসত; কোথাও কোন দিকে একটি ছায়া দেখলে—কি একটি টুপ শব্দ-হলে—কি একটু বিড়ি সিগারেটের গন্ধ-মেশানো বাতাস নাকে ঢুকলেই—ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ শব্দ করে আকাশে পাখা মেলত। পাক খেতো। এদিক থেকে ওদিক—সে দেড় মাইল দু মাইল। অথবা বসত ঠিক মাঝখানে—সেখানটা চারিদিকের কিনারা হতেই অন্তত পৌনে এক মাইল—আধ মাইল। বন্দুকের গুলি যায় না।

এ নিয়ে দু-চারজনের সঙ্গে বচসাও হয়েছে তার। সে ঠিক বচসা করেনি, সে বলেছে—আমি মশায় টিন বাজিয়ে গান করি বিলের ধারে ব'সে। তাতে আপনার কি!

বিশিষ্ট লোক দেখলে প্রশ্ন করেছে—বাবু, একটা কথা বলব? ওরা কি করেছে আপনার?

গ্রামে কথাটা এসেছে। রায়ের কাছে এসেছে। ভটচাজ-বাড়ীতেও এসেছে। তাঁরা হেসেই বলেছেন—ওর একটু ছিট টিট আছে। তা, বলবে ও ওরকম কথা। কারণ, এই তিন মাসেই গাঁয়ের লোক জেনেছে—রাত্রে কারুর অসুখে রাত জাগতে হলে—নারানকে ডাকতে হবে; কারুর বাড়ীতে আঁতুড় হয়েছে—দোরে বামুন শোয়াতে হবে—সে নারানকে ডাকলেই হবে। রাত্রিতে সেদিন খুজ্জেদের বাড়ীতে বিধবা পিসী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে বাবামু

গোপেশ্বর, বাবা গোপেশ্বর বলে চীৎকার করছিল—কিছুতেই জ্ঞান হচ্ছিল না, ডাক্তার ডাকতে লোক গিয়েছিল, কিন্তু একজন প্রবীণ বলেছিলেন—এ বাবু, বাবা গোপেশ্বর তলার অপরাধ। ওখানকার মৃত্তিকে পুষ্প আনাও। কে আনবে। বাবার স্থানে রাত্রে কে ঢুকবে? পুষ্প আনবে—

ব্রাহ্মণ না হলে হবে না। নারান বলেছিল, আমি যাব।

—পারবি তুই?

—হ্যাঁ। একটা লণ্ঠন দাও। চলে যাব। এই তো পাঁচপো পথ।

তাই সে চলে গিয়েছিল এবং ডাক্তার আসবার আগেই ফিরেছিল। ডাক্তার এসেছিল এক ক্রোশ দূর হিরণহাটি থেকে, গাড়ীতে। সে পাঁচপো পাঁচপো আড়াই ক্রোশ পথ তার আগেই মেরে দিয়েছিল।

এ তো মাথার ছিট নইলে হয় না। এবং এমন ছিট যার থাকে—তাকে ভালও মানুষ না বেসে পারে না।

শূদ্রদের পাড়ায় আরও খাতির। সেখানে স্নেহ শ্রদ্ধা দুই। বলতে গেলে তাদের মধ্যেই বাস। তারা ব্রাহ্মণদের চেয়ে আচারে আচরণে ব্যবহারে খাটো নয়। ওই রায়মশায় আর বিশ্ববন্ধুর বাবা বাদে। তবু তারা তখনও ব্রাহ্মণের ছেলে বলে শ্রদ্ধা করত। সে সেখানে প্রায় অবাধ উল্লাসে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যায় কীর্তনের দলে গাইতে না পারুক, সামনে থাকত। ওদের বিবাদে বিচারে থাকত। ওদের হুঁকোর মাথা থেকে কল্কে নিয়ে খেতো। কারুর বাড়ী সাপ বেরুলে ছুটত লাঠি নিয়ে।

সন্ধ্যায় বিলের ধার থেকে সে একবার এসে বসত বিশ্ববন্ধুর পাশে। সে পড়ত, নারান বসে থাকত। তার বই ওল্টাতো।

এরই মধ্যে কখন যে সে ওদের ভালবেসে প্রতিষ্ঠার মূলধনের আস্বাদন পেয়েছিল—তার হিসেব ঠিক দিতে পারে না সে—তবে ওই তিনটে মাসের মধ্যেই পেয়ে গিয়েছিল।

বেহিসেবী নারান হিসেবে যতই অক্ষম হোক বাবু, এই হিসেবটা আজ তার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ভাবের ঘরে সে চুরি করেছিল—সেই জন্যে বিড়ি বেঁধে ব্যবসা করবার মতলবটা আর ভাল লাগেনি; সে ঠিক করেছিল—একটা বই কিনে পূজোর মন্তর শিখে সে এই চাষীপাড়ায় পুরুতগিরি ক'রে বেড়াবে।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী তার অনেক মনে আছে শুনে শুনে।

"সমুচিত মূল্যে হার কিনিলাম দোকানে—হস্তে পদে বাঁধি রাজা আন কি কারণে?" তার পর সেই নৌকো ফিরে আসার খবরে বণিকের কন্যা-প্রসঙ্গে "পাক দিয়ে ফেলে বামা হস্তের প্রসাদ।" এসব তার মুখস্থ আছে। কয়েকটা মন্ত্র তাও কিছু জানে।—ওঁ বিষ্ণু। না, শূদ্রদের বলাতে হয় নম বিষ্ণু, নম বিষ্ণু, নম বিষ্ণু,। নম অপবিত্র পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা—য স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্য অভ্যন্তর শুচি।" হৃদয় জামাই বলতো—তর্পণের সময়—বাপের মায়ের শ্রাদ্ধের শেষে—'জানি না জানি—নে গোসাঁই ফুল পাণি।' বই পেলে বানান

করে ঠিক মুখস্থ করে নেবে। এবং ভাল করেই মুখস্থ ক'রে কাজ করবে সে।

নিজের একটি পুরুত-রূপও কল্পনা করেছিল সে।

গোঁফ-দাড়ি তখনও ঠিক ওঠে নি। উঠলে কামাবে। গলায় পৈতে থাকবে। কোঁচা উল্টে কোমরে গুঁজে কাপড় পরবে। গ্রামে কাঁধে গামছা, ভিন্ন গ্রাম হলে চাদর, বগলে ছাতা। টিকিও একটি রাখবে, তাতে ফুল বাঁধা থাকবে। এ কল্পনায় আশ্চর্য একটি আনন্দ পেয়েছিল সে। তার বাবাকে মনে পড়েছিল। তাঁর এই পোশাক ছিল। এমনি ধরন ছিল। জমিদারের কাছারীতে তাকে বসতে আলাদা আসন দিত। মোড়লপাড়ায় মোড়া দিত। বামুনপাড়া থেকেও পাঁজি দেখাতে আসত।

ওই মানুষকে ভালবাসায় মানুষেরাই কখন তাকে একটি আলাদা আসন দিয়েছে সেটিকে শক্ত কায়েমী করে নেবার ইচ্ছে তাঁর অজ্ঞাতসারেই মনে উঁকি মেরেছিল। এ একটা আশ্চর্য নেশা।

সে একদিন বিশ্ববন্ধুকে বললে—বিশু! তোদের ঘরে পূজোর বই আছে?

তখন তারা দুজনে তুই তুই হয়েছে। বিশু বললে—পূজোর বই?

—হ্যাঁ, যাতে মন্তর আছে। পূজাপদ্ধতি আছে।

—কি করবি?

—মন্তর শিখে পূজো-টুজো করে বেড়াব বাবার মতন। করতে তো কিছু হবে। ভিক্ষেমা —মানে বিপিনদার মা—প্রায়ই বলছে, বাবা বামুন হলে, এবার আমাদের পূজো টুজোগুলি কর। 'জানি না' বলতে লজ্জা লাগে রে!

বিশু বলেছিল—বাবাকে শুধোব। আজকাল তো উসব করি না আমরা। বাবাও করেন নি কখনও। তবে থাকতে পারে। আমার পৈতের পর আমাকে একখানা পড়তে দিয়েছিল। শুধোব তাঁকে।

পরের দিন সন্ধ্যেতে সইমা নিজে এসে তাকে দিয়েছিলেন।—এই নাও বাবা। বই চেয়েছিলে। পূজোর বই। বিশুর বাবারও ঠিক ছিল না, আমি কুলুঙ্গীতে তুলে রেখেছিলাম ঠাকুরঘরে। শেখো বামুনের ছেলে।

পরদিন সকালেই সে কোশাকুশি নিয়ে বই খুলে প্রাতঃসন্ধ্যা করতে বসেছিল। কিন্তু বই পড়ে একবর্ণ বুঝতেও পারেনি—অনুস্বার-বিসর্গ-রেফ যুক্ত বানানগুলো অধিকাংশই পড়তে পারেনি। পড়তে কোন রকমে পারলেও উচ্চারণ হয়নি জিভে।

সন্ধ্যেবেলা বিশুর কাছে পড়িয়ে নিয়েছিল। তাতেও সুবিধে হয়নি। বিশু বলেছিল, দ্বিতীয় ভাগ পড়েছিলি বলছিস—ভুলে গিয়েছিস। আর একবার পড়।

একটু ভেবে সে বলেছিল—হিরণহাটি থেকে একখানা প্রথম ভাগ, একখানা দ্বিতীয় ভাগ, আর একখানা ধারাপাত, একটা শ্লেট-পেন্সিল আমাকে কাল এনে দিস।

বাড়ী গিয়ে একটা টাকা নিয়ে আবার ফিরে তাকে দিয়ে গিয়েছিল।

চার

হঠাৎ—! যেন একটা ম্যাজিক হয়ে গেল। তা ছাড়া কি বলব? সেই খাটো কাপড়-জামা-পরা সেই মানুষটি, বিনীত শান্ত, আমাকে 'বাবু' বলা মানুষটি বললে—

Of man's first disobedience, and the fruit of that forbidden tree.

গোসাঁই ওই লাইনটা বলে বললে—এর পর এই বাবু! আর কি! ওই যে আরম্ভ হল—প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত, আর সামনে বিশ্ববন্ধুর মোটা মোটা বই—বাংলা ইংরেজী তাতে আর রক্ষে থাকে? থামা যায়? জ্ঞান-বৃক্ষের ফল।

অন্যে থামতে পারত—নারান পারলে না। তিন মাসে সে পুজো-পদ্ধতির মন্ত্র পড়তে পারলে ঠিক—কিন্তু বুঝতে পারলে না।

বিশু বললে—আপও একটা দুটো ক্লাসের বইগুলো পড়ে ফেল। বড় হয়ে বুদ্ধি পাকলে পড়তে ক'দিন লাগে, যদি নেশা লাগে!

তার উপর একাল। খবরের কাগজের যুগ। ওই কাগজ নেশা লাগিয়ে দিলে বেশী। তাকে পাকিয়ে দিলে শরৎবাবুর বই। ওঃ, কি নেশা, কি নেশা।

ছ মাসে তখন পুঁজি ফুরিয়েছে—তবে আউস ধান উঠেছে। চার বিঘে জমির দু বিঘে আউশ ধান ভাল হয়েছিল। পেট চলতে লাগল। বিপিনদা বললে—নারানভাই, দু বিঘের এক বিঘেতে ছোলা দাও। পাঁচ কাঠা আলু দাও। বাকীটাতে তরিতরকারি লাগাও। আলু তোমার আমি ভাগে ক'রে দেব।

নারানের চাষে ঝোঁক ছিল, সে উৎসাহ করে লেগে গেল। চাষ আর পড়া। মাঠেই বই হাতে করে গিয়ে পড়ে।

বিপিনদার মায়ের তাগিদে সত্যনারায়ণ ষষ্ঠী লক্ষ্মী মনসা পুজোও করে, কিন্তু মনে একটা খচ্ খচ্ করে, সব মানে এখনও পরিষ্কার নয়।

সে ভর্তি হল হিরণহাটির টোলে—আদ্য পড়বে। টোলে মাইনে লাগে না; কিন্তু ভোরে উঠে যেতে হয়। টোলের পণ্ডিত সকালে টোলে পড়ান, দশটার সময় ইস্কুলে হেডপণ্ডিতি করেন।

নরঃ নরৌ নরাঃ। শুরু হয়ে গেল।

রাত্রে বিশ্ববন্ধুর কাছে বসে—One morn I met a lame man পড়ে। দুপুরে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র। উনিশশো ছত্রিশ সাল পড়েছে তখন। কিন্তু আর কেউ আসেন নি তখনও। বিভূতিভূষণের নাম শুনেছে সবে। একদিন বিশ্ববন্ধু পথের পাঁচালী আনলে। নারান বইখানা বিলের ধারে বসে পড়েছিল; খুব ভাল লেগেছিল। ওই বিলের জলে আকাশের ছায়া পড়েছিল; ওধারে কিনারার কাছে—কিনারার সবুজ ঘাস বনের ছায়া কাঁপছিল। মধ্যে মধ্যে আকাশে-ওড়া পাখীগুলোর ছায়া জলের হাল্কা ঢেউয়ে বেঁকেচুরে লম্বা হয়ে মিশে গিয়ে ভেসে-যাওয়া মালার মত মনে হচ্ছিল। আমার মনে পড়েছিল দিদির বাড়িতে

আমার ছেলেবেলার কথা।

তারপর বিশু এনেছিল অপরাজিত।

অপরাজিত আমার সঙ্গে মেলে নি।

মনে হয়েছিল, বিশ্ববন্ধুর সঙ্গে মেলে। সে পরীক্ষা দিচ্ছে—পাশ সে করবেই, ভাল ছেলে। কলেজে পড়তে যাবে। অপুর মতই শান্ত বুদ্ধিমান। তবে এত গরীব নয়। না—তাও মেলে না।

মিলবার সব থেকে বড় বাধা কালটা। অপুর কাল আর আমার বিশুর কালটা আলাদা। বিশুর সঙ্গে অপুর প্রকৃতির কিছুটা মিল থাকলেও সঙ্গে একেবারে মেলে না। অপু রাত্রিতে ঘুমুত। নিশ্চিন্ত নিদ্রা। আমার ঘুম ছিল না। ঘুমের কাল আমার তখন শেষ হয়েছে। জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেলে ঘুম বোধহয় ভাল হয় না। তার উপর ওই কালটা যেন গুমোট গরমের কাল। বৃষ্টি নেই, আকাশে মেঘ—দূরে দিগন্তে মেঘ ডাকছে, হাওয়া বয় না—গাছের পাতা স্থির। বাইরে রাত্রে জন্তু-জানোয়ারের কোলাহল, সাপ অবাধগতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গর্জন করছে, ব্যাংও চেঁচাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে সাপের দাঁতের জাঁতাকলে পড়ে কাতরাচ্ছে।

উনিশশো ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ থেকে উনিশশো চল্লিশ সাল। নারানের সে কাল আজও কালকের মত স্পষ্ট। শুধু নারানের ওই গ্রাম, ওই অঞ্চলটিতে নয়—সমস্ত দেশে, বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে—তাই বা কেন—সারা পৃথিবীতে।

দিনের আলোয় ফুলফোটা পাখীর গান-গাওয়া আপন আপন খেয়ালে-খুশিতে কাজে মগ্ন মানুষময় যে অঞ্চল, যে পৃথিবীকে সে দেখেছিল, তার রাত্রির চেহারা দেখতে পেল সে। দেখল মানুষের মধ্যে জানোয়ারের—সাপের ব্যাঙের খরগোশের চেহারা। ব্যভিচার-চুরি-ডাকাতি-মাতলামিতে তারা যেন সবাই মত্ত।

নারান চল্লিশ সাল পর্যন্ত জ্ঞান-বৃক্ষের ফল কেবলই চিবিয়েছে, কেবলই চিবিয়েছে। সংস্কৃতে আদ্য পাশ করেছে, মধ্য পাশ করেছে। কিন্তু উপাধিটা দেয়নি। ভাল লাগল না সংস্কৃত, ভাল লাগল না পুরুতগিরি, পূজকগিরি সংকল্প। সংস্কৃতের সঙ্গে শুধু বাংলা উপন্যাস-গল্প পড়েনি, হাইস্কুলের ক্লাস সেভেন-এইটের পাঠ্য পুস্তকগুলোও পড়েছে। আর খবরের কাগজ। নিত্য নিয়মিত পড়ত। ওদিকে তখন তার জীবনের প্রয়োজন বেড়েছে। পড়ার বই, জামা-কাপড়-স্যাণ্ডেল দরকার হয়েছে, মধ্যে মধ্যে এখান-ওখান যাচ্ছে-আসছে, দু চারজন তার বাড়ীতেও আসছে, কংগ্রেসের কাজ করেন পাশের গ্রামের ধনদাবাবু, তখন গ্রামে এসেছেন—নদীর ওপারে দেবীপুরে শিবডাক্তার কংগ্রেসী থেকে বামপন্থী হয়েছেন। ডিস্ট্রিক বোর্ডের মেম্বারী নিয়ে ঝগড়া করে কংগ্রেস ছেড়েছে ডাক্তার। তার সঙ্গে অজয় হাজরার একদল জমেছে। মধ্যে মধ্যে শহর থেকে হীরালালবাবু আসেন, হরিপদ আসেন, এঁরা মধ্যে মধ্যে আসেন, সেও তাঁদের কাছে যায়। খরচ বেড়েছে, উপার্জন চাই। পুরুতগিরিতে

কুলোয় না, মনও ওঠে না। সে ভেবে-চিন্তে পাঠশালা খুলে বসল।

হেসে গোসাঁই বললে—গণদেবতার দেবু পণ্ডিত একসময় নারানের আদর্শ ছিল।

এতদিনে সে দেখতে পেলে চারিদিকে অন্যায়, চারিদিকে পাপ, পদে পদে মিথ্যাচার, দিনের প্রতিটি ক্ষণ কুটিল চক্রান্তের পাকেপাকে ঘুরছে, প্রবলের গর্জনে, দুর্বলের কান্নায়, হতাশার আক্ষেপে, বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রি বাড়ে, ব্যভিচারের উল্লাস প্রমত্ততার কোলাহলের মধ্যে। দুর্বলের কান্নার মত অসহায় মেয়ের অস্ফুট কান্নাও ভেসে আসে, দীর্ঘনিশ্বাসের উত্তাপ কালের গুমোটকে বাড়ায়।

এ তো ছিল। কিন্তু এতকাল দেখতে পায়নি, বুঝতে পারেনি নারান।

অম্বুবাচীতে লড়াই হয়, কুস্তি। তাতে একটা নারকেল কি একটা কিছু থাকে—সেটা কুস্তি করে জিতে নিতে হয়।

সাঁওতাল মাঝিদের বিয়ের একটা মজার নিয়ম আছে। বিয়ের সম্বন্ধ হল, কথাবার্তা হল। কিন্তু বিয়ে কথাবার্তার পাকা-পাকিতে হয় না। বরপক্ষকে একদিন মেয়েকে কেড়ে নিয়ে যেতে হয়। ওই কলেশনাথের চড়কের মেলায় নারান প্রথম যেবার দেখে, সেবার তার ভয় লেগেছিল প্রথমটা। লাগবারই কথা। মেলার এক ধারে নাগরদোলায় চড়বে বলে সে দাঁড়িয়ে আছে। নাগরদোলাটা থামল—একটা দোলা থেকে নামল তিনটে সাঁওতাল মেয়ে। তাদের তখন একটু ঘুরনপাক লেগেছে, টলছে আর খিলখিল করে হাসছে। অন্ধকার হয়ে আসছে সবে। হঠাৎ কোথকে দু-তিনটে সাঁওতাল ছুটে এল—তার মধ্যে থেকে একটা জোয়ান মাঝখানের লম্বা মেয়েটাকে ধরে কাঁধে ফেলে ছুটল।

অন্য মেয়ে দুটো চিৎকার করে বাকী মাঝি দুটোর সঙ্গে মারামারি লাগিয়ে দিলে—আর চেঁচাতে লাগল। দেখতে দেখতে আর মাঝিরা ছুটে এসে জমল। দুটো দল। একদল এদিকে, আর একদল ওদিকে। কিছুক্ষণ হৈ-চৈ বচসা মারপিটও বটে—হয়ে থেমে গেল। তারপর বসল দুদল মিলে। সেই ছেলেটা মেয়েটা এল। বিচার হল। ওরা ওই ছেলেকে বললে, তু যখন নিয়ে গেলি জোর করে মেয়েটাকে, তখন তু উকে বিয়া কর। কিরে বিটি—বিয়া করবি উকে?

মেয়ে বললে—হুঁ।

ছেলে বললে—হুঁ।

তখন সকলে উঠল—একপক্ষের নিমন্ত্রণে দু'পক্ষ মিলে মদ খেতে, ভোজ খেতে চলে গেল।

নারান সেদিন দেখে খুশী হয়ে খুব হাততালি দিয়েছিল। ভারী ভাল লেগেছিল। কিন্তু তখন আর ভাল লাগত না। সে নারান আর ছিল না। কৌতুক সে তখনও বোধ করত, কিন্তু ওতে প্রেম কোথায়?

লোকের উপকার সে তখনও করত, আগের থেকে বেশী করত। বুদ্ধির সঙ্গে করত। কিন্তু সত্য বলছি বলে নারান আজ বলে, বেশ বিচার করে সমস্ত চিরে চিরে দেখে বলে,

তফাৎ একটু হয়েছে।

এই সব মানুষ, যাদের প্রত্যেকের মধ্যে ছদ্মবেশে এক একটি জন্তু লুকিয়ে আছে, তাদের মধ্যে সেই যে একা মানুষ, তা হতেই পারে না, সেও জন্তু। কিন্তু সে সিংহ। সিংহ রাজা কিনা, সে বিচারক। সত্যিকারের সিংহের যে প্রকৃতিই হোক, যে স্বভাবই হোক আমাদের শাস্ত্রে তাই বলে।

আমাদের টোলের পণ্ডিতমশায় একটা গল্প বলতেন। ওই, সিংহীর মামা ভোম্বলদাস বাঘ মেরেছি গণ্ডা দশ, হাতীর ভেঙ্গেছি পাশ, ভিজে বাঘ খাবার তরে বনে করেছি বাস। সেই গল্পটা।

একটা লম্বা দাড়িওয়ালা ছাগল—বনে একটা উঁচু পাথরের উপরে বসে ছিল, বর্ষার সময় একটা বাঘ ভিজে গায়ে শীতে এবং ক্ষিধেতে কাতর হয়ে এসে ছাগলটাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ছাগলটার লম্বা দাড়ির মত এত লম্বা দাড়ি আর সে দেখেনি। তাই সন্দেহ হল। তখন সে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল হুঙ্কার দিয়ে—এত উঁচু পাথরের বাড়ী, অতিঘন চাপদাড়ি, নির্ভয়ে যাস নাড়ি; তুই বেটা কে রে? তখন ছাগলটা বলেছিল—আমি সিংহীর মামা। ভিজে বাঘ খাবার বাসনায় এই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছি। বাঘটা নিজে ছিল ভিজে, সুতরাং ভয়ে পালিয়েছিল, কারণ সিংহের মামা! যেতে যেতে ফিরে সিংহের কাছে গিয়ে বলেছিল সমস্ত ঘটনাটা। মহারাজ, আপনার মামার এক অন্যায় বাসনা, ভিজে বাঘ খাবেন। কেন, শুকনো বাঘ খান না। সিংহ ঘটনা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললে—আমার মামা! চল তো দেখি! এসে ছাগলটাকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি বলেছিস তুই বাঘকে? তুই কে? তখন ছাগলটা বলেছিল—মহারাজ, মহতের কর্তব্য দুর্বলকে রক্ষা করা, দুর্বলের একমাত্র আশ্রয় মহদাশ্রয়। শেষ বলেছিল—"বনে সিংহ প্রভাবেন অজাঃ চরন্তি নির্ভয়ে।"

নারান সেদিন মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে দুর্বল মানুষের আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে সিংহ মনে করেছিল।

ঘাড় নেড়ে নেড়ে গোসাঁই বলেছিল—তার ভিতরে শক্তি একটা ছিল। বলেছি তো, ওই শক্তি জিনিসটা মানুষ নিয়ে জন্মায়, কিন্তু তার তারতম্য যে কেন ঘটে, এ নারান জানে না। কারুর কোন তথ্যই তার মনে লাগে না। উত্তরাধিকার সূত্র ধরেও মূলে যাওয়া যায় না। শক্তি শুধু নয়—তার সঙ্গে প্রবৃত্তি, চরিত্র। নারান শক্তি ও চরিত্রে এমনি হয়ে উঠেছিল। অন্য রকম হতে সে পারে নি। অথবা যার জীবনে দুর্যোগ আসবে কালবৈশাখীর মত, তার এই রকমই হয়।

একটু হেসে গোসাঁই বললে—নারান সে সময় সিংহের কেশরের মত লম্বা লম্বা চুল রেখেছিল, দাড়ি-গোঁফ—তাও রেখেছিল।

* * *

আমি বললাম—গোসাঁই একটা কথা বলব?

সে বললে—বলুন।

বললাম—নারান কি হেরে গেছে?

—তা কেন বলছেন?

আমি বললাম—সে রেড সিগন্যাল জ্বালিয়ে বসে আছে। সে আলোর জ্বলা—বা জ্বলতে লাগা তো এই শুরু হয়েছে। তুমি তাকে ব্যঙ্গ করছ কেন?

একটু চুপ করে থেকে ভেবে নিয়ে সে বললে—না।

—না? জিজ্ঞাসা করে নিলাম আবার—।

সে বললে—ব্যঙ্গ ঠিক করছি না। তবে নারান সম্পর্কে ঠিক কথা বলতে হবে তো? নারান তো সে নারান আর এখন নয়। সে পাল্টালো। একবারে পাল্টালো! সেই পাড়াগাঁয়ের নদী আর বিলের ধারের যে ছেলেটি মাঠে বেড়িয়ে জলে সাঁতার কেটে মোষের পিঠে ঘুমিয়ে বালির উপর শুয়ে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে পরমানন্দে দিন কাটাতো—কোন কিছুতেই দুঃখ পেতো না—এ তো সে নারান নয়। বুদ্ধু-ভুতুমের মত আদিম কালের মানুষের যে খোলসটা তার ছিল—সেটা জ্ঞানের আলো আর যুগের মনের মশালের আগুনে পুড়ে গেল। এখন সে এ যুগের মানুষ, তার কথাবার্তার সুর আলাদা, চোখের চাউনি আলাদা, চলতে গিয়ে পা-ফেলা আলাদা। সব বদলালো। তবে একটা জায়গায় সে পাল্টায় নি—সেটা হল সেই ছেলেবেলায় কাজ করার অভ্যাস। ওতে তার আনন্দ ছিল।

নিজের বাড়ীতে সে একখানা বাইরের বাড়ী গোছের করেছিল। ভিতরের বাড়ীটা ভেঙে চুরে বদলে নতুনই করেছিল এক রকম। তার সব নিজের করা। দেওয়াল, চাল, এমন কি মেলা থেকে তৈরী দরজা-জানালা কিনতে গিয়ে পছন্দ হয় নি, সাইজ করা কাঠ আর ছুতোরের যন্ত্র নিয়ে এসে সুন্দর ক'রে লাগিয়েছিল। একটা পুকুর ছিল, সেটাকে জমা থেকে ছাড়িয়ে মাছ ফেলেছিল; নিজে জাল বুনে নিজেই মাছ ধরত। তবে—।

একটু ভেবে নিয়ে গোসাঁই বললে, তবে বলতে বলতে বিচারও করছি তো নারানের। মানুষের শক্তির সীমা আছে একটা—সেই সীমাই তার অধিকার। তার বাইরে যাওয়াও তো অপরাধ। অপরাধ না হোক, চুক তো বটেই। সেই চুকে তো মার খেতেই হবে। হবে না?

মানুষ অহঙ্কারে ওই জ্ঞানটা হারায়। নারানও জ্ঞান হারিয়েছিল অহঙ্কারে। সেটা না বললে তো সত্য বলা হবে না। নারান যখন সে চুক-ভুল করেছিল, তখন সেটা না বললে চলবে কেন? জ্ঞান মানুষ ইচ্ছে করে হারায় না, আপনার অজ্ঞাতেই হারায়, ভুল করে হারায়। অথবা নারানই ঠিক করেছিল, বিবেচক লোকেরা বা শাস্ত্রে যে বলে নিজের শক্তির পরিমাণ ক'রে তবে শক্ত কাজে পা বাড়িয়ো, প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করে সামনে দাঁড়িয়ো—ওই কথাটাই ভুল। মানুষ দাঁড়িয়ে পড়বে, তারপর শক্তি কম হয় হারবে কিম্বা মরবে, এইটেই স্বাভাবিক।

ভুল হোক ঠিক হোক, মানুষের স্বভাবে সে এটা করেছিল। অন্যায় যখন দেখতে পেলে,

তখন সর্বত্র সকল মানুষের মধ্যেই অন্যায় দেখতে পেলে। রায় মশায় থেকে ডোম-বাগ্দী সকলের মধ্যেই দেখলে এই অন্যায়। ঘাটবলরামপুর থেকে সারা দেশে দেখলে এই অন্যায়, এই অধর্ম ছড়ানো রয়েছে। কোথা থেকে শুরু—।

গোসাঁই একটু চুপ ক'রে ভেবে নিয়ে বললে—হৃদয়ের অন্যায়টা প্রথম। তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে শুরু। না—তার থেকেও আগে সেই আম-জামের বাগানে বাবুদের ল্যাংপেঙে কামুক ছেলেটার বন্দুক কেড়ে নিয়ে শুরু। তবে ও দুটো ঘটনা ঠিক নতুন নারানের নয়। এমন কি এখানে এসে কিছু দিন যে ভোরবেলা উঠে গিয়ে বিলের ধারে টিন বাজিয়ে হাঁসগুলো জাগিয়ে দিতো, উড়িয়ে দিতো, সেটাও নয়। এই সময় দু-চার দিন দু-দশজন শিকারীর সঙ্গে তার ঝগড়াও হয়েছে। সে বলেছে—আমি টিন বাজিয়ে গান করছি।

তারা বলেছে—গ্রাম ছেড়ে এখানে টিন বাজিয়ে গান করতে এসেছ—।

সে বলেছে—আপনারা নিজের বাড়ী ছেড়ে এখানে বন্দুক ছুঁড়ে হাঁস মারতে এসেছেন—আমিও এখানে গান করতে এসেছি। দেখুন না—কেমন চারদিকে বাজনাটা বাজাতে বাজাতে চলে যায়।

সেও ঠিক পড়ে না এর মধ্যে।

পড়ল যখন, তখন আর টিন বাজাতো না। তখন শিকারী এসেছে খবর পেলেই সে দৌড়ে আসত এবং তাঁদের কাছে গিয়ে গম্ভীরভাবে বলত—আপনাদিগে একটা কথা বলব?

তারা তার দিকে তাকাতো। সে বলত—কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—সে অনেক দূর থেকে।

—অনেক দূর থেকে এই নিরীহ পাখীগুলোকে মারতে এসেছেন, এরা আপনার তো কোন ক্ষতি করে নি!

শিকারীরা প্রথমেই হতবাক হয়ে যেত। সত্যি তো তেমন অভিযোগ তো করতে তারা পারে না। তারপর বলত—হাঁসগুলো কি তোমার?

—না। আমার কেন হবে।

—তবে?

—তবে ওদের মারবেন কেন?

—বেশ করব।

তখন সে মাটির ঢেলা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে হাঁসগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে বলত—আমিও তা হ'লে উড়িয়ে দিলাম।

কত জনেরা ফিরে যেত; কত জনেরা ওরই মধ্যে শিকার করত। দু দলে তিন দলে ভাগ হয়ে দু তিন দিকে ভাল হয়ে গিয়ে এদিক থেকে ওদিক হাঁসগুলো গেলে—আকাশে উড়ন্ত ঝাঁকে গুলি করত। অনেক মিস্ যেত। দু-চারটে গুলিতে দু-চারটে মরত, আবার দশ-বারোটাও মরত।

একবার সায়েব, মানে সদর থেকে সার্কেল-অফিসার এস্ ডি. ও. এসেছিল, সঙ্গে ছিল থানার

দারোগা। সে খবর পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বলতে সাহস হয় নি। সারাক্ষণই কিন্তু একটু দূরে থেকে পাশে পাশে বেরিয়েছিল। মনে মনে অনুশোচনার শেষ ছিল না নিজের কাপুরুষতার জন্য।

ঘণ্টা দুই ঘুরে সায়েবরা বসেছিল চা খেতে। ফ্লাস্কে চা ছিল, টিফিন কেরিয়ারে বিস্কুট ছিল, খাচ্ছিল। হঠাৎ এক সময় এস ডি ও. বার-কতক তার দিকে তাকিয়ে ডেকেছিল—এই শোন।

সে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করেছিল—বুকের ভিতর একটা ধড়পড়ানির শেষ ছিল না। এস. ডি ও. বলেছিল—দেখছি সেই গোড়া থেকেই সঙ্গে ঘুরছ। কেন? কিছু বলবার আছে?

এস. ডি. ও. ভেবেছিল কোন দরকার আছে ব্যক্তিটির। এমন থাকে।

সে বলেছিল, স্যার! যদি মনে না করেন তো বলি?

চমকেছিল এস ডি. ও.।—কি মনে করব?

—আজ্ঞে, এই নিরীহ জীবগুলিকে মারছেন—কি অপরাধ করেছে ওরা?

—হোয়াট! কি? কি? তারপর হেসে উঠেছিল হা-হা শব্দে। তারপর নিজেই উচ্চারণ করেছিল—সে যা বলেছে—তাকে আর হোয়াটের উত্তরে তার পুনরাবৃত্তি করতে হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে সায়েবের সঙ্গীরা এবার হা-হা শব্দে হাসতে শুরু করেছিল। একজন বলেছিল—ওয়াণ্ডারফুল! নিরীহ জীব—হা-হা হা-হা।

সে আর থামে না। কিন্তু এস.ডি ও. গলা ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে নিতেই সে ইঙ্গিত বুঝে থেমেছিল। সায়েব এবার জিজ্ঞাসা করেছিল—কি নাম?

ভয় হয়েছিল নারানের। অনুশোচনা হয়েছিল—কেন সে বলতে গেল? তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল—আজ্ঞে, শ্রীনারায়ণ গোস্বামী।

—গোস্বামী। বৈষ্ণব? তিলক-কণ্ঠী কই?

—আজ্ঞে না।

—তবে গান্ধাইট? গান্ধী-শিষ্য?

—আজ্ঞে না। তবে ভক্তি করি তাঁকে। নমস্কার করেছিল সে। কথা বলতে বলতে ভয় ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই হয়। কেউ কথা বলতে বলতে ভেঙ্গে যায়। কেউ সাহস পায়। নারান ভাঙ্গার মত ধাতুতে গড়া নয়। সে সাহস পেয়েছিল। তাই নমস্কারও করতে পেরেছিল।

এস. ডি. ও. বলেছিল—হুঁ। কি করা হয়?

—আজ্ঞে, একটি পাঠশালা করেছি। আর, এই পুরুত-টুরুতের কাজ-টাজ করি।

—মাছ মাংস খাও?

—মাছ খাই। মাংস খাই না।

—কিন্তু মাছ কেন খাও? তারা কি অপরাধ করেছে? এস. ডি. ও-র কথা বলার ভঙ্গি দেখে সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠেছিল। দারোগার হো-হো শব্দে হাসতে মানা—সে

মুখ ফিরিয়ে মুচকে হেসেছিল।

সে হাত জোড় ক'রে বলেছিল—আজ্ঞে, ওটা দেশে এমন চলিত হয়ে গিয়েছে যে, মনে থাকে না—মনে হয় না। তবে অন্যায় বটে স্বীকার করছি। আজ থেকে মাছ আর খাব না, আপনার সামনে বললাম।

সে উঠে চলে এসেছিল একটি নমস্কার ক'রে। কিন্তু সেই দিন থেকে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছিল।

এখানেই নারানের জীবনের ভবিষ্যতের বীজটি তার অজ্ঞাতসারেই বিধাতা টুপ করে ওই বিলের ওই উর্বর জমিতে ফেলে দিয়েছিলেন; বীজটি হয়তো তারই পায়ের চাপে মাটিতে বসে গিয়েছিল।

ওই বিলের ধারেই পরিচয় হয়েছিল ভূতনাথ চাটুজ্জের সঙ্গে। সেদিন সে ভোর রাত্রে উঠে বিলের ওপাশের গাঁয়ে গিয়েছিল। সীতাহাটির মফেজ সেখের কাছে। কার্তিকের শেষ। রবিফসলের জন্যে জমি চাষ দিয়ে বীজের ভাঁড় হাঁড়ি দেখতে গিয়ে কাল দেখতে পেয়েছে ভাল মটরশুঁটির বীজগুলি সব আরসোলায় খেয়ে নষ্ট করেছে। এফোঁড়-ওফোঁড় করে করে কুরে কুরে খেয়েছে। বড় আপসোস হয়েছিল। এ বীজ সে গতবার বিশ্ববন্ধুকে লিখে কলকাতা থেকে এনে পত্তন করেছিল। এবার বেশী জমিতে দেবে। কিন্তু বীজ শেষ। বিশ্ববন্ধুকে লিখে কলকাতা থেকে আনিয়ে বোনা—সে অনেক দেরি হয়ে যাবে। মনে পড়ল—আধ সের বীজ সে সীতাহাটির মফেজ সেখকে দিয়েছিল। সেখ বড় ভাল চাষী। সে চেয়েছিল, ও-ও দিয়েছিল। রাত্রে শুয়ে মনে হয়েছিল শেষ রাত্রে উঠে মফেজের কাজে যাবে—যদি আধ পোয়া এক পোয়াও দেয়, তবে যত্ন কার খানা করে দেবে। পত্তনটা থাকবে। তারপর বিশ্ববন্ধুকে লিখবে—যদি সময়ে বীজ পাঠায় তখন দেখা যাবে। মফেজের কাছে বীজ নিয়েই সে ফিরছিল। সকাল সাতটা তখন। সূর্য উঠেছে। মিষ্টি রোদ আধ-পাকা আধ-কাঁচা আমন ধানগুলির উপর পাতলা সোনালী চাদরের মত পড়ে আছে। ধানগাছগুলির শীষে পাতায় শিশির লেগে রয়েছে, বিন্দু বিন্দু হয়ে রোদে ঝরছে। আকাশে হাজারে হাজারে পাখী উড়ছে। কালো-সাদা বিন্দুর মত। পঙ্গপালের ঝাঁক মনে হচ্ছে। এবার হাঁস এসেছে বেশী। এই হাঁস আসার সময়। আশ্বিনের শেষ হতে আসে। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল সে। একটা কঠিন শব্দের রেশ ছুটে চলে আসছে ক্ষীণ হ'তে হ'তে, তাকে পার হয়ে চলে গেল; চলে ওই যাচ্ছে, সীতাহাটির বাইরের জঙ্গলের গাছপালার পাতার মধ্যে হারিয়ে যাবে।—ওই—ওই আবার।—ঠু-ই।—একটা শনশনানির সঙ্গে শব্দটা ছড়িয়ে চারিদিকে ছুটছে—তার দিকেও আসছে। আবার।

তার রাগ হল। আবার আজ ব্যাধ এসেছে। ব্যাধই বটে। না, ব্যাধের থেকেও খারাপ, ঘৃণ্য। ব্যাধের হল জীবিকা—বৃত্তি। এই করেই খায়। মাংস বিক্রী করে। আর এরা—পেট ভরাবার জন্য নয়, ক্ষুধার দায়ে নয়—রসনার তৃপ্তির জন্যে আর হিংসার কৌতুকে এদের হত্যা করে। মনে তার জোরটা এবার বেশী। মাছও সে ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং

বলবার অধিকারটা তার যেন বেড়েছে। হন-হন করে পা চালিয়ে এসে সে বিলের ধারে দাঁড়াল। আকাশে পাখীগুলো আর বিন্দুর মত বা পঙ্গপালের মত মনে হচ্ছে না। কিন্তু কই ? ব্যাধেরা কই ?

—দু-ম। শব্দ উঠল, ছড়াচ্ছে শব্দটা জলের বুকের উপর দিয়ে। ওই—ওপারে বড় বড় ঘাস জঙ্গলের মধ্যে মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে।

আকাশ থেকে নীচের দিকে মুখ করে তিনটে পাখী পড়ছে। ঝাঁকের পাখীরা ক্যাঁও-ক্যাঁও শব্দ করে পাক দিয়ে বাঁক নিচ্ছে।

—দু-ম। আবার।

ওঃ—এবার আট-দশটা পাখী নীচের দিকে পড়ছে। যেন ঝরে পড়ছে। সে ছুটল। ছুটে এসে ঘাস জঙ্গলটার সামনে এসে দাঁড়াল। তখন বাবুরা বেরিয়ে এসে সিগারেট খাচ্ছে—আর কয়েকজন লোক জলে নামছে, ক'জন মাঠে মাঠে ছুটছে পড়ে-যাওয়া পাখীগুলোকে কুড়িয়ে আনবার জন্যে। কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল, এ যে বেশীর ভাগ ঘাটবলরামপুরের লোক। রায়বাড়ীর কর্মচারী, তাদের পাইক, বড় রায়ের সম্পর্কে ভাইপো হরেন রায়—ভট্‌চাজবাড়ীর বিশ্ববন্ধুর জাঠতুতো ভাই দীনবন্ধু, ওপারের অজয় হাজরা—থিয়েটার করে, কংগ্রেস করে, এমন কি ডাক্তার শিবু চাটুজ্জে, বামপন্থী লীড়ার—সেও রয়েছে।

অজয় হাজরা বললে—এই এসেছে! আমরা বলাবলি করছিলাম। তোমার বাড়ী হয়ে এসেছি, ভেবেছিলাম—পারমিশনটা নিয়ে আসব!

সে তাকিয়েছিল কেন্দ্রের লোকটির দিকে। একটু কালো—হ্যাঁ, কালোই বলতে হবে, কালো দোহারা পরিমার্জিত চেহারা একটি তিরিশ-বত্রিশ বছরের যুবা, পরনে মিহি ধুতি, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, শহরের সভ্যতা অনুযায়ী লম্বা রুক্ষ চুল, বন্দুক হাতে, সিগারেট মুখে—দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

অনুমানে চিনতে তার দেরি হল না। ইনি তা হলে বড় রায়ের জামাই। ভাল ঘরের ছেলে, শিক্ষিত মানুষ, গ্র্যাজুয়েট, কলকাতায় থাকেন, ব্যবসা করেন। রায়ের অনেক সম্পদ, অনেক সম্পত্তি, এবং সন্তান ওই একমাত্র কন্যা। এঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এঁকে ঘরের ছেলের মত রাখবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু তা থাকেননি ভূতনাথ। রায়ের গ্রাম্য স্বভাব এবং অতিহিসাবী সংসারের মধ্যে থাকতে পারেননি। তিনি কলকাতায় ছিলেন। আগে মধ্যে মধ্যে আসতেন জামাইয়ের মত। কিন্তু মধ্যে কি হয়েছিল—যার জন্য কয়েক বৎসর একেবারেই আসেননি। জামাই কলকাতাতে যখন থাকতেন, তখন মেয়ে এখানে থাকত, দেশে এলে—মেয়ে যেত শ্বশুরবাড়ী। কয়েকবার মেয়েও কলকাতা গেছে। এবার শ্বশুরের সঙ্গে মিটমাট হয়েছে, ভূতনাথ শ্বশুরবাড়ী এসেছেন। কথাটা সে শুনেছিল। এঁরই কাছে থাকবার জন্য বলেছিলেন রায় মশাই। সে তাঁর দিকে তাকিয়েই থাকল—কিন্তু গ্রামের জামাই অনেক দিন পর এসেছেন—তাকে কি বলবে—কি বলা উচিত, বুঝতে পারছিল না।

শিবু ডাক্তার তার দৃষ্টি দেখে বললে—কে জান ?

সে একটু হেসে বললে—তা চিনেছি। রায় মশায়ের জামাই। নমস্কার করল সে।

ভূতনাথ বললেন—আমার নাম ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আপনি রায় মশায়ের জামাই, আমাদের ঘাটবলরামপুরের সবারই আদরের মানুষ। জামাইবাবু।

শিবু ডাক্তার বললে—এর ওপর আপনার কিছু বলার নেই।

হেসে ভূতনাথ বলেছিলেন—তা নেই। তারপর বলেছিলেন—তুমি নাকি এখানকার হংসরক্ষক। কিন্তু কেন? হাঁসের উপর এত মায়া কেন?

হেসে সে বলেছিল—নিরীহ পাখী। আপনার আনন্দে থাকে, কলকল করে—মায়া হয়, দেখতে ভাল লাগে। কোন অনিষ্টও করে না। এই আর কি।

—তুমিও মাছও ছেড়ে দিয়েছ শুনলাম। মাছ-পাঁঠার কথা তোমার সঙ্গে চলবে না। কিন্তু কত ধান ওরা খায় বল তো? এই তো সারা রাত টিন বাজিয়ে হাঁস তাড়ায় লোকেরা।

তা বটে। এটা এতদিনেও ভাবেনি নারান। কিন্তু উত্তর সে সঙ্গে সঙ্গেই পেলে—এবং দিলে—তা খায়। বলছি না। কিন্তু কতটুকু খায় বলুন? কত খায়? এই এত বড় মাঠ, শুধু এ মাঠই নয়—দেশের মাঠে দু-চার মুঠো করে খেয়ে বাঁচে।

—বাঃ। বেশ বলেছ। আমি আরও খুশী হতাম—যদি বলতে মানুষ যেভাবে নানান কৌশলে আইনের জোরে গরীব মানুষগুলোকে সর্বস্বান্ত করে, চাষ করে ফলানো ধান কেড়ে নেয়—তার তুলনায় এরা কতটুকু খায়? তাদের কি করছেন?

নারান অবাক হয়ে গিয়েছিল। ভূতনাথবাবু কি শ্বশুরের কথা বলছেন?

ভূতনাথ হেসে আবার বলেছিলেন—গোসাঁই অবাক হয়েছে শিববাবু।

নারান বলেছিল—তা একটু হলাম স্যার।

—কিন্তু আমি তো জামাই—ছেলে তো নই। তা ছাড়া মানুষ যখন, তখন সত্যি কথাটা বলতে হবে।

—আপনি প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ।

—তুমিও ছোট মানুষ নও গোসাঁই। সব শুনেছি আমি। খুব ভাল লেগেছে। তা হাঁস মারতে বারণ তুমি করতে পার। অন্তত আমি আর মারব না। তবে কি জান গোসাঁই জীবে দয়ার মানেও হয় না, পরিণামও ভাল নয়। ন্যাড়া-নেড়ীর দল বাড়ে। ক্ষাত্রশক্তি না থাকলে চলে? না, থাকলে এই আমাদের অবস্থা হয়? বিদেশীর পায়ের তলায় থাকতে হয়?

এই সময়ে রায়বাড়ীর পাইক এবং স্থানীয় মজুরশ্রেণীর লোকেরা ফিরে এসে মরা হাঁস-গুলোকে নামিয়ে দিলে। গোটা কুড়ি হাঁস। কয়েকটা হাঁস তখনও জীবিত ছিল—মিট-মিট করে তাকাচ্ছিল।

তাদের দিকে তাকিয়ে নারান বলেছিল—আমি যাই। নমস্কার।

—যাবে? কষ্ট হচ্ছে? তা যাও। ও দেখে আমারও কষ্ট হয়। যাও। হ্যাঁ শোন, রাত্রে আমার ওখানে—না খেতে হবে না—এস। বুঝেছ? কথা বলব। আমার বাচ্চা দুটোকে পড়াবার লোক খুঁজছিলাম। তুমিই পড়াও। এস, বুঝলে।

মানুষটিকে ভাল লেগেছিল নারানের। বেশ মানুষ। বড়লোকের জামাই হয়েও একালের মানুষ। এবং বেশ খোলা মানুষ। রাত্রে মদ নিয়ে বসেছিলেন ভূতনাথবাবু—নারানকে দেখে সংকোচ করেননি। বলেছিলেন—নারান, আমি বাপু মদ খাই, নিয়মিত একটু করে খাই। বন্ধুবান্ধব জমলে কোন কোন দিন বেশীও খাই। কিন্তু লুকনো আমার নীতিবিরুদ্ধ বুঝলে। কংগ্রেসকেও ভালবাসি, মেম্বরও বটে—জেল যেতে প্রস্তুত আছি, জেল কেন ফাঁসি যেতেও ভয় নেই; গান্ধীজীকেও ভক্তি করি। কিন্তু মদ খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়, তা মানি না। তোমার যদি ঘেন্না হয়, বসতে বলব না, কাল সকালে এস। তা যদি না হয়, তবে বস। কথা বলি।

সে হেসে বলেছিল—না-না—না। ঘেন্না হবে কেন? তা করব কেন? বলে সে বসেছিল।

সেইদিনই ভূতনাথ চাটুজ্জে পাঁচ টাকা মাইনেতে তাকে ছেলে দুটির প্রাইভেট মাস্টার নিযুক্ত করেছিলেন—মাইনে আমি দেব—আমার স্ত্রীর কাছে পাবে। ওই সুদের টাকা, মানুষ-চোষা ধানের দাম থেকে নয়। পরিষ্কার টাকা, কোথাও তার লালচে দাগ নাই।

অজয় হাজরা এবং আর ক'জন ভাম হয়ে বসেছিল।

* * *

বুনো হাঁস নিয়ে যেচে পরের সঙ্গে—যে এস. ডি. ও. পর্যন্ত—ঝগড়া না হোক, ওই জাতীয় কিছু করতে পারে এবং হাঁস মারা বারণ করবার জন্যে মাছ পর্যন্ত ছাড়তে পারে—লোকে তাকে বলে পাগল। অর্থাৎ অসুস্থমস্তিষ্ক। আর, পাগলই যদি হয়, তবে সে সেই ঝগড়াটে পাগল, যে শুচিবাইগ্রস্তের অশুচি বস্তু খুঁজে বেড়াবার মত অন্যায় খুঁজে খুঁজে ঝগড়া করে।

সে অসাধারণ মানুষ হতে পারে—আবার, সম্বলহীন প্রতিষ্ঠাকামীও হতে পারে। ন্যায়-বাদী হওয়ার মত এমন প্রতিষ্ঠার সোজা পথ তো আর নেই। ওটা অন্তর থেকে অকৃত্রিমও হতে পারে। আবার প্রতিষ্ঠার তৃষ্ণা থেকেও ওটা জন্মাতে পারে। নারানের কি হয়েছিল—তা আপনি বিচার করে নেবেন।

নারানও ভেবে ঠিক করতে পারে না। সময় সময় ধাঁধা লাগে। তবে শালগ্রাম ছুঁয়ে সে অনেকবার নিজের কাছেই নিজে বলেছে—না, প্রতিষ্ঠার তৃষ্ণা থেকে নয়—নয়—নয়। তবু সন্দেহ আছে। প্রতিষ্ঠা-কামনাও ছিল বই কি—নিশ্চয় ছিল।

মানুষকে ভালবাসত—তা থেকে তার ইচ্ছা হয়েছিল, মানুষকে ভাল করবে। মানুষের উপর—নিরীহ মানুষের উপর যে যেখানে অন্যায় করবে—তার প্রতিবাদ সে করবে—করবে—করবে। সেটা প্রতিষ্ঠা-কামনা থেকেও হতে পারে—কিছুটা তো বটেই। তা থেকেই সে প্রতিজ্ঞা করেছিল। দোষ না গুণ তা নিয়ে সে আজ মিছে মাথা ঘামায়। হয়তো দুঃখে। কিম্বা রাগে।

সে সময় এ বিচার করবার সময় তার ছিল না—একটা প্রবল বন্যার মত আবেগের বন্যায় চলেছিল সে। তখন ভরা যৌবন তার। বয়স পূর্ণ কুড়ি। ১৯৪০ সাল। কাল অনুকূল। দৃকপাত করে নি। নইলে সে বিপিনের সঙ্গে ঝগড়া করে? সেদিন সকালে উঠেই বিপিনের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে সে ছুটে গিয়েছিল—কি হ'ল? বিপিনের সঙ্গে মায়ের আজকাল প্রায় ঝগড়া হচ্ছে। বিপিনের মা আজকাল ক্রমাগত আক্ষেপ করছে—আমার কিছু হ'ল না। জীবনটা বৃথাই গেল। রাঁড়ী-কুঁড়িরা তীর্থ করে এল—কাশী গয়া পেরাগ বিন্দাবন মথুরা পর্যন্ত। একশোটা টাকা তাদের জুটল—আমার জুটল না।

গ্রামের কয়েক জন মেয়ে তীর্থের সেথো-পাণ্ডার সঙ্গে তীর্থ করে এসেছে; তার মধ্য দুজন সন্তান-সন্ততিহীনা বিধবা ছিল; তারা সারাটা জীবন খেটে-খুটে কিছু জমিয়ে তীর্থ করে মাথা কামিয়ে বাড়ি ফিরেছে—কিন্তু বিপিনের সঙ্গতি থাকতেও তার মায়ের যাওয়া হয় নি। বিপিনের মায়ের হাতের টাকা পর্যন্ত সে ছেলেকে দিয়েছে। তাতে বিপিনের দোষ নেই। তীর্থ যাওয়ার হজুগ উঠবার দু'মাস আগে জমি বিক্রি করেছিল বিপিনেরই জাঠতুতো ভাই হরিশ। বিপিনের পিতামহের জমি। বিপিনের মা বউ হয়ে এসেছিল দশ বছর বয়েসে—তখন এক সংসার। সে সময় বিপিনের মা ওই জমি থেকে কাঁকুড় খেঁড়ো তুলে এনেছে। জমিটায় খেঁড়ো কাঁকুড় ভাল হয়। ওই জমি হরিশ বিক্রী করবে শুনে, বিপিনের মা নিজেই ছেলেকে বলেছিল—ওটা যেমন করে হোক কেন্। জমিটা বড় বাকুড়িও বটে, মাপে দেড় বিঘের উপর। হরিশ জ্ঞাতিকে দিতে চায় নি। খদ্দেরও দাঁড়িয়েছিল পাঁচটা। ফলে দেড়বিঘে জমির দাম উঠে গেল চারশো টাকা। তার উপর তখন রেজেস্ট্রী অফিসে জমিদারের প্রাপ্য শতকরা কুড়িটাকা সঙ্গে সঙ্গে দাখিল করতে হবে। রেজিস্ট্রী-খরচা আছে। পাঁচশো টাকার উপর চলে যাবে। বিপিনের হাতে তিনশো টাকার বেশি ছিল না। মা নিজে থেকে তার সম্বল দুশো টাকা বের করে দিয়েছিল। জমি কেনা হল। কিন্তু এর ঠিক মাস দুয়েক পরেই ঝুলনের সময় বৃন্দাবনের পাণ্ডা এসে যাত্রী সংগ্রহ করতে লাগল, এ গ্রামের ওই দুটি বিধবাই হল অগ্রণী—তারা আর কয়েকজনকে জোটালে। বিপিনের মা তখন টাকা চাইলে—ছেলেকে। ছেলে বললে—এখন এই বর্ষার সময় টাকা কোথা পাব আমি?

—ধান বেচ।

—ধান বেচব তো খাব কি? তা ছাড়া ক'বিশ ধান আছে? বেচলে তো একশো টাকাও হবে না।

মাকে তখন নারানই বুঝিয়েছিল! নারান বিপিনের মায়ের ভিক্ষেপুত্র তার উপর পূজো-আর্চা করে দেয়। সব থেকে বড় কথা—নারানের এখন মান্য হয়েছে। সকলে সম্ভ্রমের সঙ্গে ভালবাসে। আগে যেটা স্নেহ ছিল, এখন সেটা সম্ভ্রম।

মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—আসছে বছর ধান উঠলেই বিপিন টাকা দেবে। এবং সে নিজে ব্যবস্থা করে তাকে তীর্থে পাঠিয়ে দেবে।

মা বলেছিল—তার আগেই যদি মরে যাই বাবা।

নারান বলেছিল—তা যাবে না—আমি বলছি।

—তুমি বললেই যদি হয় বাবা তাহলে তো হতো। তা তো হয় না। আমার মন বলছে—এ বছর আমি পার হব না।

নারান বলেছিল—তার এবার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল,—বলেছিল—তাই যদি হয় ভিক্ষেমা, মরেই যদি যাও, তবে স্বগ্‌গে গিয়ে পাথরের ঠাকুরের বদল সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখবে।

অবাক হয়ে গিয়েছিল ভিক্ষেমা।

অভিমানে বৃদ্ধার চোখে জল এসেছিল, সজল চোখে বলেছিল—তুমি এই কথা বললে বাবা?

—কেন? কি অন্যায় বললাম? আমি বলছি দেখতে তুমি ভগবানকে পাবেই, দেখবেই।

খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল। বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—ছেলে ভুলাচ্ছ বাবা?

—না, ছেলে ভোলাই নাই। শোন। শাস্ত্রের কথা। এক গ্রামে দু'জন লোক ছিল। একজন বড়লোক—অনেক টাকা, অনেক সম্পত্তি। অনেক টাকা সম্পত্তি সহজে হয় না, সোজা পথে হয় না—সে দেখতে পাচ্ছো। তার জন্যে লোক ঠকাতে হয়। পরের পাওনা ফাঁকি দিতে হয়; নিজের পাওনা সুদের সুদ তস্য সুদে বাড়িয়ে অঙ্ক ভুল ক'রে দেনাদারকে সর্বস্বান্ত ক'রে আদায় করতে হয়। অনেক কিছু করতে হয়। দু টাকা গরীবকে ধার দিয়ে দশ টাকা দাবী করে—পঁচিশ টাকার গাইটা নিয়ে পাইকারকে বিক্রী করতে হয়।

ওই বিধবাদের একজনের কথা কৌশলে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল নারান।

গল্পের উপর ভিক্ষেমার প্রত্যয় তাতে বেড়েছিল। তার সঙ্গে আরও অন্য বিত্তশালীদের প্রতিও ইঙ্গিত করেছিল। সে রায়বাড়ী থেকে ভটচাজবাড়ী পর্যন্ত।

তারপর বলেছিল—আর একজন ছিল—ধার্মিক গৃহস্থ। সংসার কর্ম করত, নিজের ন্যায্য পাওনাটিই নিত। ন্যায্য দেনাটি পাই পয়সা মেটাতো। যথাসময়ে ভগবানকে ডাকত। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিত। মিষ্টি কথা বলত। গরীব দুঃখীর দুঃখে-কষ্টে চোখের জল ফেলত। খাবার সময় ক্ষুধার্ত এলে—নিজের ভাতটি—তাকে দুমুঠো দিয়ে নিজে একমুঠো খেতো।

এখন বড়লোক বাড়ীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠে করলে, পুরুত রেখে দিলে, কিন্তু নিজে বড় যেত না—দেখত না। ঘরে গরু আছে, মান্দের আছে। আস্তাবলে ঘোড়া আছে, সহিস আছে—ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুর আছে, পুরুত আছে। আর এ লোকটি ঘরে ঘট পেতে পট টাঙিয়ে নিজে ফুল দেয়, চন্দন দেয়, জল দেয়। নিজে যা খাবে—তাই ঠাকুরকে আগে ভোগ দিয়ে খায়।

বড়লোক শেষ বয়সে তীর্থে গেল। এর আর যাওয়া হল না। তা ঘরের পটেই প্রণাম ক'রে বলল—তুমিই আমার সর্বতীর্থ।

কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা হব-হব, এমন সময় একটি অনাথ ছেলে এসে ওই বড় বাড়ীতে গিয়ে বললে—বাবা, সারা দিন কিছু খাইনি—আর আমার আশ্রয় নাই। দুটো খাবার—আর রাত্রে একটু থাকতে পাব?

বড়লোক বললে—না না, কোথাকার চোর না ছ্যাচড়। রাত্রের জায়গা হবে না। আর, খাবার এ অসময়ে সন্ধ্যেবেলা কোথায় পাব? যাও ভাগো।

অনাথ ছেলেটি মুখ চুন করে ক্ষিদেতে কাতর হয়ে আসছে, পথে সেই গৃহস্থটির সঙ্গে দেখা। গৃহস্থ বলল—হ্যাঁ বাবা মানিক, এমন মুখ চুন কেন রে? ছেলে বললে—বাবা, আমি অনাথ, এই চেয়ে-চিন্তে খাই, লোকের দাওয়ায় রাত কাটাই; তা, আজ আর আহারও জোটে নি, আশ্রয়ও না। রাত্রে যে কোথায় থাকব, কি খাব—তা জানি না।

গৃহস্থ বললে—এস বাবা, আমার বাড়ী এস। এইখানে থাকবে। এইখানে খাবে। নিয়ে গিয়ে একটু গুড়, একঘটি জল দিলে। বললে, ব'স বাবা, রান্না হোক, খাবে। রান্না হ'ল—খাওয়ালে ছেলেটিকে ডেকে—তারপর বিছানা করে দিলে। ছেলেটি শুলো।

ওদিকে বড়লোকের বাড়ীতে এল—ঠিক সন্ধ্যের মুখে এক হিন্দুস্থানী, হাতে লাঠি, এই গোঁফ, এই পাগড়ি। বললে—আমি গয়ার পাণ্ডার লোক, সেখানে আপনি গিয়েছিলেন, এই আংটিটা ফেলে এসেছিলেন, পাণ্ডাজী পাঠিয়ে দিলেন। নিয়ে আসছি।

আংটি দেখে চমকে উঠল বড়লোক—এ যে হীরের আংটি! কিন্তু তার নয়। তবু লোভ সামলাতে পারলে না। বললে—হ্যাঁ—হ্যাঁ। তা, ব'স। থাক। ওরে পাণ্ডাজীর লোককে থাকবার জায়গা দে, ময়দা দে, ঘিউ দে। কাঠ দে। মিঠাই এনে দে।

রাত্রি দুপুর, তখন গৃহস্থের মনে হল, যেন কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে, শাঁখ বাজছে, পদ্মগন্ধ উঠছে—আর একটা খুব জ্যোতি চোখে লাগছে। চোখ খুলে ফেললে, দেখলে সেই অনাথ ছেলে—মাথায় চূড়া, হাত বাঁশী—হাসছে, বলছে—চল, আমি যে নিতে এসেছি তোমাকে। ওঠ, রথ এসেছে। চল। গৃহস্থ রথে চড়লেন। রথ চলল। গাঁয়ের ওপাশে রথটা গিয়েছে—তখন গৃহস্থ দেখছেন—বড়লোকের বাড়ী থেকে একজন এই জোয়ান এই গোঁফ, এই পাগড়ী, হাতে লাঠি—বড়লোকটির চুলের মুঠো ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে চলছে—অন্ধকারের দিকে।

গৃহস্থের সঙ্গে ভগবান ছিলেন। তিনি হাসলেন। বললেন—গয়ার প্রেতশিলা থেকে যম প্রেতদূত পাঠিয়েছে।

গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করলে—কেন ভগবান, ও তো অনেক তীর্থ করেছে, বাড়ীতে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছে—আর আমি—

ভগবান বললেন—আমি স্বর্গেও থাকি না—বৈকুণ্ঠেও না—তীর্থেও থাকি না। ভক্ত, আমি তোমার মনেই যে চিরকাল বাস করছি। এবার চল তুমি আমার মনে আমার বুকে বাস করবে।

বৃদ্ধা একমুহূর্তে ভুলে গিয়েছিল। সব সত্য বলে মনে করেছিল।

নারান?

গোসাঁই যেন নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছিল—নারান? উত্তর দিয়েছিল নিজেই—নারান তখনও নিজে ঠিক নাস্তিক হয়ে ওঠেনি, কিন্তু এ গল্পটা সে বানিয়ে বুড়ীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিল। তবে—। হ্যাঁ। তবে মিথ্যে বলার পাপ কি প্রতারণা সে করেনি। ছেলেকে

চাঁদ দেখিয়ে, চাঁদকে আয় আয় বলে ডেকে আঙুল দিয়ে কপালে চিৎ দিলে যা হয়, তাই হয়েছিল।

থাক সে কথা। বুড়ী সেদিন ভুললেও কয়েক দিন পর আবার সুর ধরেছিল। এবার ঝগড়ার সুর নয়, দুঃখ পাওয়ার কান্নার সুর। যখন-তখন বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠত—আহা হা-রে! ওঃ! এমন কপাল! মর্ত্যলোকে মানুষ-কুলে জন্মে—! আঃ, কিছু হ'ল না। কিছু হ'ল না। শুধু নরক। নরকই ঘেঁটে গেলাম।

এতে বিপিন মৃদু প্রতিবাদ করে। কিন্তু যে মুহূর্তে বুড়ী বলে—লোকের ছেলেতে মজুর খেটে মা-বাপকে তীর্থ করায়। আমার এমন গর্ভ! এমন পোড়া পেট! হায়রে! হায়রে! হায়রে! অমনি বিপিন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

আজ হয়তো তাই হয়েছে। এবং আজকের ক্রোধ তার মাত্রা ছাড়িয়েছে। হয়তো এর পর একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে বসবে: নারান একটা বাখারি ছুলছিল—একখানা বাঁটুল ছোঁড়া ধনুক তৈরী করবে। হনুমানের উৎপাত বড্ড বেড়েছে। সে কাটারিটা ও বাখারিখানা রেখে ছুটে গেল। গিয়ে দেখলে সত্যিই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে বসে আছে। বিপিনের বাড়ীর পুরনো মান্দের কানাই বাউড়ী—চুপ করে গালে হাত নিয়ে বসে আছে। চোখ থেকে জলের ধারা গড়াচ্ছে। বাড়ীটা নিস্তব্ধ। বিপিনের কপাল ফেটেছে, ফুলে উঠে একটা আবের মত দাঁড়িয়েছে এবং সেটা ফেটে রক্ত গড়িয়েছে একটা শীর্ণ রেখায়। বিপিন ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করছে—বেরোও, নিকালো, আভি নিকালো। এই মুহূর্তে। চাই না—নেহি মাংতা।

কানাই কোনরকমে বলছে—তা তো যেতেই চাইছি। আমিও আর থাকব না। ভগমান বললেও থাকব না। কিন্তু আমার মাইনে মিটিয়ে দাও।

—দোব না, দোব না, দোব না।

নারান মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। কানাই বলে উঠল—দেখ দেখ, ঠাকুরমশাই দেখ, ব্যাভারটা দেখ মোড়লের। আমাকে ঠেসে এক চড় মারলে—বলে কেঁদে ফেললে সে।

বিপিন বলে উঠল—বেশ করেছি, খুব করেছি, এখুনি যদি না বেরোও তুমি তবে ঘাড় ধরে বার করব। কার ক্ষ্যামতা আটকায়! ঠাকুরমশায়! ঠাকুরমশায়কে টানিস কেন? আমি কারুর ধার ধারি?

ঘটনাটা মায়ের সঙ্গে বিপিনের ওই ব্যাপার নিয়েই আরম্ভ। মা আজও সেই গর্ভকে দোষ দিচ্ছিল। আর আক্ষেপ করছিল। বিপিন তামাক সাজছিল, সে গর্জে উঠেছিল—মা!

মা ভয় খায় নি। সে বলেছিল—কেনে রে, মারবি না কি?

—মারব না, মরব। গলায় দড়ি দোব।

—তা নইলে ষোল কলা পূন্ন হবে কি করে? তা তুই গলায় দড়ি দিবি ক্যানে? আমিই দোব। বলেই তুলসীতলায় গিয়ে 'ঠুই ঠুই' শব্দ করে মাথা ঠুকে বলতে শুরু করেছিল—আমার মরণ নাই? নেবে না তুমি আমাকে?

বিপিনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল—সেও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তুলসীতলায় এসে মায়ের সামনে ওপাশে মাথা ঠুকতে শুরু করেছিল—মরণ দাও, মরণ দাও—আজ রাত্তিরে—ওর আগে আমাকে মরণ দাও। না দিলে কাল তোমাকে তুলে বিলের জলে ফেলে দোব। মরণ দাও।

বিপিনের মা স্তব্ধ হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তার বউ এসে তাকে ধরে বলেছিল—ওগো তুমি এ কি করলে গো! ওগো, রক্ত পড়ছে গো!

বউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল বিপিন। ওপাশে উঠোনের ওধারে কানাই ছুটে এসে তাকে জাপ্‌টে ধরেছিল।—মোড়ল!

কানাই বিপিন থেকে বয়সে বড়। তার বাপের আমলের লোক। চুল পেকেছে, কিন্তু, দেহে সামর্থ্য আছে। সে এমন জোরে জাপ্‌টে ধরেছিল যে, বিপিন আর মাথা ঠুকতে পারে নি। তা না পারলেও সে তরুণ জোয়ান—সে ঝাপটা দিয়ে কানাইয়ের হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে নিয়েই সজোরে তার গালে এক চড় মেরেছিল।—হারামজাদ!

কানাই 'বাপ' বলে বসে পড়েছিল। কিছুক্ষণ মুহ্যমান হয়ে বসে ছিল। বিপিনের মা এসে তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে ডেকেছিল—কানাই! কানাই! ও কানাই!

বিপিন ওতেই থমকে ছিল। কিন্তু মুখের আস্ফালন সে ছাড়ে নাই। বলছিল—এত বড় বাড় তোর! ছোটলোক চাকর হয়ে আমার গায়ে হাত! চলে যাও, তুমি চলে যাও। জবাব দিলাম। চাই না।

কানাই সামলে নিয়েও বসে ছিল, ওঠে নি, ওঠবার ঠিক অবস্থা ছিল না। দুরন্ত অভিমানে ক্ষোভে সে অধীর হয়ে পড়েছিল। এতকাল সে এ বাড়ীতে কাজ করছে, মনিবের এত হিত সে করেছে। মনিবও তাকে ভাল বেসেছে—সেই মনিব আজ—।

সে বসেই বলেছিল,—বেশ, আমার মাইনে মিটিয়ে দাও—আমি চলে যাচ্ছি।

—কিসের মাইনে? কার মাইনে? দোব না। আমি দোব না।

—দেবে না? আমি খেটেছি তার মাইনে দেবে না?

—না—না—না। বেরোও, নিকালো, আভি নিকালো! নেহি মাংতা। এখুনি চলে যাও। যা-ও!

—আমার মাইনে দাও।

—না। দোব না। দোব না। দোব না।

এই মুহূর্তে গিয়ে পড়েছিল নারান।

গোসাঁই বললে—নারান যাবার পর যে কটা কথা হয়েছিল—শুনেছিল। বিপিন আরও একটু সরে গিয়ে তামাক সাজতে বসল আবার।

নারান একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারও মাথার মধ্যে একটা রাগ জমছিল। বিপিন তার কিছু ধারে না, কিন্তু কানাইয়ের ধারে এ কথাটা ভুলে যাচ্ছে। ভুলেই যাচ্ছে না শুধু—দেবে না বলে আস্ফালন করছে। মানুষ এমনিই বটে। বিপিনের কিছু আছে কিনা,

কানাইয়ের নেই—তাই এত আস্ফালন।

সে বললে, গম্ভীরভাবেই বলে বসল—বিপিনদা, ওর মাইনেটা তুমি মিটিয়ে দাও। বরং কাল আসতে বল। দুদিন পর আসতে বল। না বলো না। ওটা তোমার অন্যায় হচ্ছে।

—অন্যায়! চমকে উঠল বিপিন।—আমার অন্যায় হচ্ছে! হুঁ!

—তার মানে?

—তোমার মুখেও এই শুনতে হল নারান!

—কেন? আমার উপকার করেছ ব'লে তোমার অন্যায়কেও আমাকে ন্যায় বলতে হবে নাকি?

—তাহ'লে নিয়ে যাও ওকে আদালতে। আমার নামে ওকে দিয়ে এক নম্বর ঠুকিয়ে দাও, ন্যায় হোক।

—না, তা করব না। তুমি আপনা থেকে দেবে। শুধু মাইনে নয়, এই চড় মারার খেসারৎ দিতে হবে, কানাইয়ের হাত ধরে বলতে হবে—দোষ হয়েছে।

—নারান!

—উঠে এস কানাই। আমার সঙ্গে চলে এস।

সন্ধ্যেবেলা সে কানাইদের পাড়ায় গিয়ে ব'সে এপাড়া-ওপাড়ার আরো মান্দেরী রাখালী যারা করে তাদের ডেকেছিল।

* * *

সনাতন পৃথিবী, মাটি, জল আকাশ-বাতাস—সেই পুরাতন। মানুষও তার মধ্যে পুরাতন। কিন্তু তার পরিবর্তনের শেষ নেই। মানুষ জন্মায়, শৈশবে-বাল্যে, কৈশোরে-যৌবনে-বার্ধক্যের পথে মৃত্যুতে পৌঁছয়—তা-ও সনাতন। কিন্তু তবু মানুষ কালে-কালে নতুন। পুরাতনকে যে আঁকড়ে ধরে থাকে প্রাণপণে জড়িয়ে। নতুনের আসবার পথ বন্ধ করে দেয়—তবু কাল কোন্ পথে যে তার মধ্যে নতুনকে সঞ্চারিত করে দেয়—তা মানুষ জানতে পারে না। যখন জানতে পারে, তখন নতুনের উল্লাসের মধ্যে পুরাতনের মমতা এবং পুরাতন বিচিত্রভাবে কর্পূরের মত উড়ে গেছে; রেখে গেছে মাত্র একটি গন্ধ। তার নাম স্মৃতি।

এ কথাগুলি নারান গোসাঁইয়ের কথা নয়। সে এসবের খুব ধার ধারে না। এ কথা ক'টি কথকরূপী আমার। কথক তো ব্যাখ্যা করে থাকেন। যা হল এর পর—তা আমি জানি—এ গল্পের শ্রোতারা বুঝতে পারছে। কাল, সকল কালেই বিরাট এবং প্রধান, কিন্তু একালে তিনি শিঙা হাতে বাঘছাল প'রে উদ্যত ত্রিশূল-ধারী। তিনি মুক্তি-বিধাতা এবার।

গোসাঁই বললে—তাই-ই বললে। সে বললে, নারান মনে করেছিল, বেগ পেতে হলে তাকে। এই নিরক্ষর, পায়ের-তলায়-চাপা মানুষগুলি উঠতে বললে আদৌ উঠতে চাইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। ওরা তো উঁচু জাত, ভদ্রজাতের পায়ের চাপেই চাপা নেই, নিজেদের বিচিত্র মমতায় ওরা নিজেদের বেঁধে রেখেছে; তার উপর মাথার মধ্যে আছে এক

জটিল অপরাধ-বোধ। সব তাতেই ওদের অপরাধ হয়। ভদ্র উঁচু জাতের সঙ্গে উত্তর করলে অপরাধ হয়, ছুঁয়ে ফেললে অপরাধ হয়, তাদের খাবারের দিকে দৃষ্টি পড়লেও অপরাধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য! সেদিন সন্ধ্যেতে নারান অবাক হয়ে গেল যে, এক কথায় তারা রাজী হয়ে গেল। হিতোপদেশের গল্পের সেই বুড়োর কঞ্চি—আঁটি বাঁধা হয়ে একখানা লোহার কড়ি হয়ে দাঁড়াল। কঞ্চির আঁটি বাঁধা মুখে বলা যত সোজা, কাজে তত সোজা নয়; কঞ্চির গড়নই হ'ল বাঁকাচোরা, সেগুলো আঁটি বাঁধতে গেলে গায়ে-গায়ে লাগে না। এ যেন এক মুহূর্তে কঞ্চিগুলো সোজা হয়ে গায়ে-গায়ে সেঁটে লেগে এক হয়ে গেল। কথা হ'ল—বিপিনের বাড়ীতে কেউ আর কাজ করবে না। কানাই ছাড়ছে—তার জায়গায় কেউ যাবে না, তা ছাড়াও রাখালটা ছাড়বে—তার এঁটো-কাঁটা উঠোন পরিষ্কার করা বাউড়ী ঝি ছাড়বে; তার গরু কোন গাঁইটে পালের রাখালও চরাবে না।

একদিনেই—বিপিনই শুধু নয়—গোটা গাঁয়ের লোক চমকে উঠল।—এ কি!

শুধু ভদ্রলোকই নয়, ওই কানাইরাও চমকে উঠল। তাই তো! এ কি!

নারান নিজেও চমকালো।—তাই তো! এ কি!

কিন্তু পিছুবার কারুর উপায় নেই। শিবু ডাক্তার এল—বাহবা দিয়ে গেল। ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়ে গেলেন ধনদাবাবু। লোকটির ভাষা মিষ্ট, মানুষের মত মানুষ। তিনি মিটিয়ে দিলেন নিজের ঢঙে। নারানকে পর্যন্ত বিপিনের কাছে দোষ স্বীকার করালেন। বললেন—হোক শূদ্র, তোমার চেয়ে বয়সে বড়, ভিক্ষেদাদা—তার সঙ্গে এরকম কথা ঠিক হয়নি। এ কাজ একদিন অপেক্ষা করে ওকে ঠাণ্ডা হতে দিয়ে বুঝিয়ে করাতে হ'ত। ও তা করত। নিশ্চয় করত। স্বীকার কর—দোষ স্বীকার কর।

করলে তা নারান। বিপিনও তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু কানাই শুধু শুনলে না কথা, সে মাইনে মিটিয়ে নিয়ে বললে—আমি আর কারুর বাড়ীতেই কাজ করব না বাবু। আমি দিন-মজুর খাটব। আর, এই টাকায় গাড়ী-গরু ক'রে ইষ্টিশানে ভাড়া-টাড়া বইব। আমাকে মাফ করেন।

আর ওই জোটটি আল্‌গা হয়েও রয়ে গেল। তার বাঁধনের দড়িটা রয়ে গেল—নারানের হাতে। যেন সে-ও তার সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছে।

•

পুরো একটা বছর সে গ্রামে ছিল না। সেটা একচল্লিশ সাল। সে গুরু-ট্রেনিং পড়তে গিয়েছিল। এক বছর পড়ে সে খুব ভালভাবে পাশ করে বাড়ী ফিরল—সে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে। ম্যাট্রিকের কোর্স সে মোটামুটি পড়েছে। সংস্কৃত বাংলায় সে কলেজের পরীক্ষা দিতে পারত। ফিরে এল একচল্লিশ সালের শেষে। তখন পৌষ মাস।

বিশ্ববন্ধু তখন এম-এ পাশ করে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চাকরীতে ঢুকেছে। ভাল চাকরী। সে বিয়েও করেছে। করেছে—তার অনুপস্থিতির সময়, সে গুরু-ট্রেনিং পড়ছিল যখন, তখন—বউ দেখে সে খুশী হল। বিশ্ববন্ধু তার খুব তারিফ করলে। আর বললে—বিয়ে কর।

সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তাকিয়ে ছিল বিলের দিকে।

হ্যাঁ, বিয়ের কথা মনে হয় বই কি। হয়। বিলের ধারে দুটো সারসের মত বড় পাখী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। একটা এক পা গুটিয়ে ঘাড়টা নিচু করে লম্বা ঠোঁটটা নামিয়ে আধবোজা চোখে দাঁড়িয়ে, যেন ভ্রূক্ষেপহীন—আর একটা চঞ্চল—তার লম্বা ঠোঁটটা এর ঘাড়ের উপর দিয়ে ওর পিঠের উপর প্রসারিত। মধ্যে মধ্যে পিঠে মৃদু আঘাত করছে।

নিষ্ক্রিয়টা মাদী। হঠাৎ সেটা পাখা মেলে উড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মদ্দটাও। ক্যাঁকক্যাঁক শব্দ করে অনুসরণ করলে।

ওগুলোর নাম মানিকজোড়। ও পাখী সচরাচর মারে না কেউ, মারতে নিষেধ আছে। এরই নাম ক্রৌঞ্চমিথুন। কিন্তু মানিকজোড় নামটা বড় মিষ্টি। ওই পাখী দুটোর দিকে তাকিয়েই বিশ্ববন্ধু বললে—তুইও এইবার বিয়ে কর।

সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বিয়ে! হ্যাঁ, বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় বই কি। কিন্তু—!

বিশ্ববন্ধু বললে—ঘরদোর করেছিস, সুন্দর ঘর হয়েছে। এবার গুরু-ট্রেনিং পাশ করে এলি, পাঠশালাতে গভর্নমেণ্ট গ্র্যাণ্ট পাবি। পাঠশালাতে আজকাল ছেলেও হবে। রায়দের বাড়ীতে টিউশন আছে। এবার বিয়ে কর। আমি বিয়ে করলাম। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

নারান বললে—সব সত্যি। কিন্তু এও তো বললি—আয় কত হবে বল্ দেখি? সব মিলিয়ে তিরিশ। আর, জমি তো পাঁচ বিঘে। এতে কি হবে? এদিকে যুদ্ধ লেগে তো বাজারে আগুন লেগেছে। বাজার তো চড়ছে দিন দিন। তুই ভাই মোটা মাইনে পাস। মাইনে বাড়বে। উন্নতি হবে। কিন্তু আমি? আমি তো এত ক'রেও পাঠশালার পণ্ডিত রয়ে গেলাম। কি করব বিয়ে করে?

—তুই বিয়ে করবি না?

নারান বলেছিল—নাঃ।

তার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছিল বিশ্ববন্ধু। মুখ-দেখে-মন-খোঁজা দৃষ্টি। তারপর হঠাৎ বলেছিল—একটা কথা সত্যি বলবি?

—কি বল্? তোকে কোন্ কথা না বলি?

—তুই কি পলিটিক্স্ করছিস? মানে দলে জুটেছিস?

বিশ্ববন্ধুর সন্দেহটা ভিত্তিহীন ছিল না বাবু, সে আপনি জানেন, বেশী তো আপনাকে বলতে হবে না। উনিশশো তিরিশ সালে—আমাদের থানাতে আপনাদের গ্রামের তিনজন জেল গিয়েছিল। আর গিয়েছিল ডেটেন্যু নরেনবাবু—তিনি এখানে বাস করেছিলেন। তাঁকে ধরছি এখানকার। বান আসে বাবু—গ্রামের ধারের বাঁধ ভেঙ্গে গ্রামে জল ঢুকে বালি ফেলে মাটি খুলে তার কাজ ক'রে ফিরে যায়, কিন্তু ওই বাঁধের ভাঙ্গন দিয়ে অনেক সময় এমন নালার সৃষ্টি ক'রে যায় যে, তাকে আর বন্ধ করা যায় না, সেটা নালাই হয়ে যায়। ক্রমে বছরে বছরে সেটা গভীর হয়, চওড়া হয়। তাই হয়েছিল এখানে। জেলাতে ষড়যন্ত্র মামলা হয়ে গেল। এ থানার পাঁচ-সাতটা ছেলে জেল গেল, আন্দামান গেল। একটা নালা হাতের

আঙুলের মত দাঁড়া মেলে ছড়িয়ে গেল। রাজনীতি তখন ওই হাতের আঙুলের মত দাঁড়া মেলে ছড়িয়েছে দেশময়। ধনদাবাবুর কথা বলেছি—শিবু ডাক্তারের কথা বলেছি, বড় বড় পাকাপাকা রাজনীতিক কর্মী এ অঞ্চলে আসেন, যান। হীরালাল দাশগুপ্ত আন্দামান-ফেরৎ। হরিপদ ভার্গব—সেও জেলখাটা লোক। এ অঞ্চলটা ওই বিল আর নদীর জন্যে দুর্গম বলে এখানে সকলে ঘাঁটি গাড়তে চেষ্টা করছিল।

কাল—তখন আপনি নিজে বলছিলেন—বাঘছাল প'রে ত্রিশূল হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে, নাচবে।

শুধু কাল নাচলে তো হয় না! কালীকে নাচতে হয়। কাল নাচায়—মানুষের বুকের মধ্যে তার প্রকৃতি কালী হয়ে নাচে। তখন কান থাকলে বাতাসে ভেসে আসা গান শোনা যায়—ও মা দিগম্বরী, নাচ গো!

ইউরোপে যুদ্ধ লেগেছে, ইংরেজ হারছে; এ দেশে যুদ্ধ আসি-আসি করছে। সুভাষচন্দ্র এ দেশ থেকে নিরুদ্দেশে ভেসেছেন। কংগ্রেস ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ করেছে—কাজ তেমন হয় নি। তবে একটা কিছু হবে। তার ইশারা যেন মানুষের চোখে ফুটে উঠেছে—গাছ-পালার ফিস্-ফিসিনিতে ভাসছে; আশঙ্কা আর উল্লাস দুই মিলে দিনরাত্রি জুড়ে একটা কি থম্‌থমে ভাব। কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন।

নারান ক্ষুদিরাম নয়, প্রফুল্ল চাকী নয়, সে শিক্ষিত নয়—কিন্তু সে পাগলও বটে, বেপরওয়াও বটে; গ্রামের ধনী অবস্থাপন্ন সমাজ সকলকে দাবিয়ে নিজের মধ্যে একটা অসম্ভবের ক্ষুধাও জাগিয়েছে। সে কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেয় নি—তবে তার প্রীতি সকলের প্রতি। ধনদাবাবু, শিবু ডাক্তার, অজয় হাজরা এদের যেন আপন বলে মনে করে। হীরালাল দাশগুপ্ত, হরিপদ ভার্গব—এদের উপর শবসাধক তান্ত্রিকের প্রতি আকর্ষণের মত একটা আকর্ষণ অনুভব করে।

তার বেশী যোগ নয়। তবে সেটাও কম নয়। যোগ এতদিন সে দিত, কিন্তু কোথায় একটা সঙ্কোচ আছে।

বিশ্ববন্ধু আবার তাকে প্রশ্ন করেছিল—নারান!

—কি?

—চুপ করে রয়েছিস্? তাহলে—

নারান বলেছিল—না রে! তবে ভাই যদি কিছু আরম্ভ হয়, তবে 'মালক্‌বাজী' খেয়ে পড়ব লাফিয়ে; যা হয় হবে।

মালক্‌বাজী—উল্লাসে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে ডিগ্‌বাজী দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

বিশ্ববন্ধু বলেছিল—বুঝে-সুঝে চলিস নারান! এবার এই যুদ্ধের সময় ইংরেজ গুলি-খাওয়া বাঘ হয়ে গিয়েছে। এবার ওরা ছিঁড়ে ফেলবে। মুভমেণ্ট হলে একেবারে গুলি চালিয়ে

শুইয়ে দেবে।

বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠেছিল নারানের—গুলি চালিয়ে শুইয়ে দেবে?

—নিশ্চয়! রাইটার্স বিল্ডিংএ শুনি তো। তার উপর দেখি সাহেবগুলো গান্ধী-টান্ধীর নাম করলে দাঁত কিস্‌কিস্ করে। ভীষণ রাগ। তার থেকে বিয়ে-টিয়ে কর—ঘরকন্নায় মন দে—

—উঁহু! উঁহু! উঁহু!

রাত্রে সে সেদিন বিয়ের কথাই ভেবেছিল। ভেবেছিল, ইচ্ছে করে ভাবে নি, ভাবনা আপনা-আপনি ঘুরে-ফিরে মনের মধ্যে এসেছিল। ভাবতে গিয়ে অনেক মেয়ের মুখ ভেসে গিয়েছিল মনের মধ্যে।

তাদের মধ্যে জাতি-বিচার ছিল না। নানান জায়গায় নানান সময়ে দেখা এবং ভাল-লাগা মুখ। চেনাও বটে—একখানা মুখ অস্পষ্ট হয়ে গেছে, কয়েকবারই মনে করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু স্পষ্ট হয় নি। নামটাও অনেক চেষ্টা করে মনে পড়েছিল। নিরু। মাসীর ভাসুরঝি। কালো মেয়ে, কিন্তু কি তেজ! আর কি সুন্দর চুল এবং এবং সাজপোশাক। কথাবার্তা। একখানা অতি সুন্দর মেয়ের মুখ যেমন বার বার মনে পড়েছিল। তাকে সে স্টেশনে ট্রেনে যেতে দেখেছে। কয়েকবার দেখেছে। এই লাইনে হয় বাপের বাড়ী, নয় শ্বশুরবাড়ী—সিঁথিতে সিঁদুর আছে। তবু মনে পড়ছে।

হঠাৎ এমনই মুহূর্তে তাকে সেদিন কানাই বাউড়ী ডেকেছিল—ঠাকুরমশাই! মাস্টারমশাই!

সে বুঝেছিল কিছু ঘটেছে পাড়ায় কিম্বা গ্রামে, তার জন্য ডাকছে তাকে। বৎসর খানেক বাইরে থেকে তার কানাই-এর গলা শুনে চিনতে দেরি হয়েছিল। এমনই মুহূর্তে ডাক শুনে মনও ভরে গিয়েছিল বিরক্তিতে, তিক্ততায়।

গোসাঁই বললে—অন্য অন্য যারা সারাজীবন বিয়ে না করে থাকে, তাদের সবাই ব্রহ্মচারী নয়, তবে দু-একজন শুনেছি যাকে ভালবেসেছে, তাকে না পেয়ে আর বিয়ে করে নি। দেশ-সেবকরা আছেন—তাঁরা দেশকে ভালবেসে বিয়ে করেন নি; বিয়ে করে তাঁদের জড়িয়ে পড়তে হয়, জেলে দুর্ভাবনা হয়, মরতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণা হয় মনে। যাঁরা বিয়ে করেন না তাঁরা মুক্ত—কষ্ট পান না। এ কথা ঠিক। কিন্তু তাঁরা কি মনে মনেও এমনি নিষুতি রাত্রে কিম্বা নির্জন অবসরে নারানের মত ভাবেন না?

নারান তাঁদের মত দেশসেবক ছিল না।

সেটার প্রমাণ সে পরে পেয়েছিল। বলব সে কথা যথাসময়ে।

ওদিকে আবার তাকে ডেকেছিল—ঠাকুরমশাই গো! ও ঠাকুর!

বিরক্ত হয়েই সে এবার সাড়া দিয়ে প্রশ্ন করেছিল—কে?

—আমি গো—কানাই।

—কানাই? কি হল?

—একবার উঠতে হবেন গো।

কানাই-ই তার প্রধান চেলা। বিপিনের বাড়ী কাজ সে ছেড়েছে—সেক্ষেত্রে নারানের কথা সে রাখে নি, কিন্তু নারান ঠাকুরের প্রতি আনুগত্যের তার শেষ নেই। সেদিন নারান গিয়ে না দাঁড়ালে তার মানটা থাকত না—এ সে জানে। জমিদারের কাছে গেলে তার মাইনে সে হয়তো পেতো—কিন্তু বিপিনের জরিমানা হত, লাঞ্ছনা হত; তাকেও লাগত জমিদারের নজর—গোমস্তার পাওনা—পেয়াদার রোজ। তাছাড়া এই যে প্রতিকারটি তাদের নিজেদের জোটবাঁধার শক্তিতেই হয়েছে—তার গিঁঠটি যে নারান ঠাকুরের বাঁধা, তা অস্বীকার করবে কি করে? এতে তারা খুশী হয়েছে বেশী। অথচ, ঠাকুর তাদের কাছে একটি পয়সা নেয় নি এবং ঠাকুরের সব থেকে বড় গুণ—ঠাকুর ওদের মেয়েদের দিকে তাকায় না।

না। তা নারান তাকাতো না।

অথচ—

গোসাঁই বললে—অথচ, জানেন, সেদিন রাত্রে যখন তার মনের চোখের উপর দিয়ে অনেক মেয়ের মুখ ভেসে চলছিল—তার মধ্যে ওদের পাড়ার দু-একটা মেয়ের মুখও ছিল।

নারান ওদের দিকে তাকাতো না—তার প্রতিষ্ঠার জন্য।

সেটা কি ছোট কথা বাবু? বলুন?

প্রতিষ্ঠা পুণ্য তাতে সন্দেহ নেই। অন্তত নারানের নেই। স্বর্গে গিয়ে মর্ত্যের মানবীর জন্য মানুষের মন উতলা হয়—সে নামতে চায় মাটিতে। কিন্তু পুণ্য তাকে নামতে দেয় না। বেঁধে রাখে। প্রতিষ্ঠাও তাই। প্রতিষ্ঠা পুণ্য। পুণ্যফলকে বিষাক্ত করে তোলে যারা, তারা অসুর, তারা দৈত্য। আপনি বিচার করে দেখুন—যতগুলো বড় বড় অসুর-দৈত্য-রাক্ষসকে বধ করতে শক্তিকে কি নারায়ণকে মর্ত্যে আসতে হয়েছে—তারা গোড়ায় বড় বড় যোগী তপস্বী। তপস্যা করে সিদ্ধি যে-ই পেয়েছে, অমনি তার বলে—তারা অনাচার অত্যাচার শুরু ক'রে অমৃতকে বিষ করেছে।

নারান তা করেনি। করেনি বলেই—ভাগ্যচক্র বলুন, নিয়তি বলুন, নারানকে দিয়েই এই অসুরের মত বিকৃত মানুষটিকে ধ্বংস করার সংকল্প গ্রহণ করিয়েছিল। নারান সংকল্প করেছিল ওকে মারবার, কিন্তু সেই সংকল্প গ্রহণ করিয়েছিলেন উনি।

উপরের দিকে হাত তুলে দেখিয়েছিল সে।

বিকৃত মানুষ। মানুষটার শক্তি ছিল—শিক্ষা ছিল—তেজ ছিল—কর্মশক্তিও ছিল—তবুও বিকৃত হয়ে গেল; প্রবৃত্তি-দোষে আর কর্মচক্রে।

থাক সে কথা।

না—থাকবে কেন? কথাটা অবান্তর আমি বলিনি। কানাইকে সেদিন নিয়তিই বোধহয় পাঠিয়েছিল। এখান থেকেই সে পালার শুরু।

নারান তাড়াতাড়ি নেমে এসে বলেছিল—কি কানাই? সন্ধ্যেবেলা এসেছি। এসেই

বিশ্ববন্ধুর বউ দেখতে গেলাম। তারপর ওরই সঙ্গে বিলের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। নইলে, তোমাদের পাড়ায় গিয়ে দেখা করে আসতাম।

কানাইয়ের সঙ্গে আরও তিন-চার জন। কানাই বললে, তা আমরা ভাবছিলাম। আসবেন, নিশ্চয় আসবেন ঠাকুর। এলেন না, আমরাও একটুকুখানেক বেস্ত ছিলাম। বুয়েছেন। সে কাজ সফল হয়েছেন। এখন আপনার কাছে এসেছি। এর বিচার করেন।

—কিসের ?

—চোর ধরেছি, চোরের।

—চোর ?

—আমার জমি থেকে ধান কেটে এবার ফাঁক করে দিয়েছিল। কাঁচাধান কেটে নিয়েছিল। কি করব ? এ জমি ভেঙে কার্তিক মাসে কলাই বুনেছিলাম। ঠিক ধরতে আরম্ভ করেছে ; আর চুরি। দিন ছয়েক আগে একবার চুরি হয়েছিল। তখন থেকে পাহাড়া দিছিলাম। ক'দিন আসে নাই। আজ ঠিক এসেছে। এসেছে—জমিতে নেমে টেনে তুলতে লেগেছে কুঁজো হয়ে, আমরা চারজনাতেই ছিলাম—একবারে চাবুলে চেপে ধরে ফেলাল্‌ছি। কিন্তুক—

—কিন্তুক কি ?

—রায়মশায়ের পাইক—আর তার ছেলে।

—রায়মশায়ের পাইক আর তার ছেলে ?

—হ্যাঁ, ডোমন লগ্‌দী আর তার বেটা পরান।

নারানের সন্দেহ হল—তাহ'লে কি এটা বিষয়ী জমিদার রায়মশায়ের নির্দেশ ? জমি সামান্য। সামান্য জমির জন্য রায়মশায় এমন করবেন ?

কানাই তার সন্দেহ ভেঙে দিলে। বললে—বিলের মুখে ওই টুকুন জমি—আমার বাবা মজানালা ভেঙে করেছিল। এখন আশে-পাশে আরও জমি উঠেছে। বিল সরেছেন। সে সব ভেঙেছে ডোমন। এখন এই আমার টুকুন চাই। জানে, আমি দোব না। গমস্তা ওকে কানে মন্তর দিয়েছে—উ ফসল লাগাক, তু কেটে কেটে লে। দেখ না—দু বছর বড় জোর তিন বছর যেতে-না-যেতে যেচে এসে বলবে—ডোমন, তুমি ভাই লও জমি। চালাক কেমন, শুধু আমার জমির কাটে না, নিজের জমির খানিক-খানিক কাটে।

—কোথায় তারা ?

—বেঁধে রেখেছি বেটাদের।

—মেরেছ নাকি ?

মাথা চুলকে কানাই বললে—তা, দু-চার ঘা দিয়েছি বই কি।

—বেশী নয় তো ? দাগটাগ করনি তো ?

—না। তা হয় নাই।

—তবে নিয়ে যাও সকালবেলায় রায়মশাইয়ের কাছে। যেমন আছে তেমনি থাক।

গোসাঁই বললে—সকালবেলা পর্যন্ত যেতে হল না। নিয়ে যেতেও হল না তাঁর কাছে। তাঁর দুই দারোয়ান এসে হাজির হল—তার সঙ্গে গোমস্তা। রূঢ়কণ্ঠে হুকুম হল—খোল বাঁধন। এবং সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ৎ দাবী হল—বেঁধে রেখেছ কেন?

নারান ফিরে শুতে যাচ্ছিল—কণ্ঠস্বর শুনে ফিরল। কানাইয়ের বাড়ী অল্প দূরে। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতিটি কথা স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছিল। সে ফিরে কানাইয়ের বাড়ী গিয়ে ঢুকে বললে—কানাই, ধ'রে ওদের থানায় নিয়ে যাও। চৌকিদারকে ডাক।

গোমস্তা বললে—গোসাঁই, আগুনে খোঁচা দিয়ো না—আগুন খোঁচা খেলে জ্বলে ওঠে। পোড়া আঙরা, ছাই ঘেঁটে-ছড়িয়ে তোমার পাখা গজিয়েছে।

—পিদিমের শিষে পোকার পাখা পোড়ে, বাজপাখীর পাখা পোড়ে না, ঝাপ্‌টায় উল্টে গিয়ে পিদিম ওল্টায় রূপলাল।

জনতাটি বেশ জমাট ছিল—আর সকলের বুকে ছিল চাপা রাগ। তার আঁচ রূপলাল গোমস্তা অনুভব করছিল। সে বললে—বেশ, তাই গিয়ে আমি বলি রায়মশায়কে।

নারান বলেছিল—ধাপ্পা দেবার জায়গা পেলে না রূপলাল? রায়মশায়ের অসুখ। আমরা জানি।

—হুকুম দেবার আরও লোক আছে। ডোমনের পরিবার দিদিঠাকরুণের কাছে এসেছিল—তাঁর হুকুম তিনি পিসীঠাকরুণকে দিয়ে আমাকে বলে পাঠিয়েছেন।

পিসী বললে—উঠিয়ে নিয়ে এস আর কানাইকে নিয়ে এস। শুধু নিয়ে এস নয়, গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে এস।

বাক্যগুলি এদেশের জমিদার-ঘরের বাক্য বটে। জমিদার-ঘরের কন্যাদের দর্প নারান জানে। অবিশ্বাস হ'ল না। তার উপর নারান ওদের বাড়ীতে ছেলে পড়ায়। সে ভাল করে জানে।

হেসে গোসাঁই বললে—আপনি নারানের চেয়েও ভাল ক'রে জানেন। দিদিঠাকরুণ শুধু কন্যা নন—উত্তরাধিকারিণী। তার উপর পিসীঠাকরুণ বহন করে এনেছেন। মশালের আগুন—পাতকাটিতে লেগে বেশী একটু জ্বলে থাকবে—কিন্তু আগুন এখানে ভয়াল, আরতির আলো নয়, তার উপরে হাত দিয়ে কপালে তাপ নেওয়া চলে না। হাত পোড়ে, কালো ধোঁয়ায় হাতে-মুখে দাগ ধরে।

নারান উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ভয় সে করে না। সে জানে তার শক্তি। সে জানে অন্যায় তার নয়। সে জানে—লড়াই দিলে জিতবে। জানে—পিছুলে তার মর্যাদাই শেষ হয়ে যাবে না—এই গরীবদের বুক ভেঙে যাবে। তাদের বুক বাঁশ দিয়ে ডলা যাবে। সে বললে—বল গে—যিনি হুকুম দিয়েছেন, তাঁকে বল গে—চুরি করেছে—চোর থানায় যাবে—জমিদার-বাড়ী যাবে না। একালে মানুষ আর জমিদারের হুকুমে দারোয়ানের লাঠির ভয়ে চলে না। সেটা ওরা ভুলে গেছে।

রাত্রে শুয়ে ভাল ঘুম হল না। মেয়েদের মুখ আর বারেকের জন্যও মনের চোখে ভেসে

উঠল না। ভাবলে—ভালই হয়েছে, ব্যাপারটা আজ রাত্রেই ঘটেছে। এক বছর সে বাইরে ছিল। ছেলেদের অন্য কেউ পড়াচ্ছে। সে-ই পড়াক। সে আর যাবে না।

বিশ্ববন্ধু তার আয় হিসেব করছিল—এই মাইনের টাকা নিয়ে।

ভোরবেলা কান্নার রোল উঠল। সে উঠে পড়ল। কি হল? কান্নার দিক লক্ষ্য করে ছুটে গেল। রায়বাড়ীতে কান্না। রায় মারা গেলেন। শরীর অসুস্থই ছিল—উঠেছিলেন বাইরে যাবেন ব'লে—উঠেই পড়ে গেলেন। লোকজন ছুটে এসে দেখলে—রায় নেই।

নারানের সর্বাগ্রে মনে হল ডোমনদের কথা। রায় মারা গেছেন, এখন ঝগড়ার সময় নয়। ফিরে এল সে কানাইয়ের বাড়ী। বলবে—দে, দে, ওদের আজ ছেড়ে দে। চল, সব ওখানে চল। কিন্তু তার অনেক আগে ওরা দল বেঁধে ডোমনদের নিয়ে চলে গেছে থানায়। দল বেঁধে গেছে পাছে পথে আবার রূপলাল লোকজন নিয়ে ডোমনদের ছিনিয়ে নেয়।

* * *

বড় বড় কল চলে উমানাথবাবু, চাকার দাঁতে পাকে পাকে। ঘোরাটা শুরু হয় আস্তে, ক্রমে দ্রুততর হয়। যে চালায়, সে একটার পর একটা ঘাট বদল করে দেয়; শক্তির সঞ্চয় বুঝে নারানের জীবনেও তাই হ'ল। তার যে চলা শুরু হয়েছিল—বিপিনের সঙ্গে কানাই বাউড়ীর ঝগড়ার সূত্র ধরে, সেই সূত্রের টানে এসে সে রায়দের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াল। তাতে তার ভয় ছিল না। কিন্তু একটা অস্বস্তি হচ্ছিল।—যে, হয়তো শুনবে—রায় কথাটা শুনে রেগে উঠেছিলেন এবং তা থেকেই উঠতে গিয়ে পড়ে গেছেন এমন করে।

শবযাত্রার সঙ্গে সে গিয়েছিল। রায়বাড়ীর ব্যাপার—লোকজনের অভাব হয়নি, কিন্তু এসব কাজে নারানের মূল্য অপরিসীম। শত্রুতা যার সঙ্গে যতই থাকুক, নারান শ্মশানে বন্ধু সকলের এবং তার চেয়ে সেখানে বড় বন্ধু আর সে-সময় ও অঞ্চলে কেউ ছিল না। তাকে ডাকতেও হয় না, সে নিজেই আসে। এখানেও সে নিজেই এসেছিল এবং অগ্রণীর মত সব কাজই সে করেছিল—সেখানে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেন নি—সে রূপলালও না, রায়বাড়ীর কন্যাও না। যদি ভেবে থাকে নারানের কাছে এ বেগার পাওনা—তা ভাবুক—নারানের মনেও সে প্রশ্ন জাগেনি। শব গিয়েছিল কয়েক ক্রোশ দূরে গঙ্গা-তীরের ঘাটে। গ্রামের শ্মশানে মুখাগ্নি ক'রে কন্যা বাড়ী ফিরেছিলেন। নারানরা শব নিয়ে গিয়েছিল। ফিরল পরদিন সকালে। ফিরে রায়বাড়ীর দোরে দাঁড়িয়ে নিমপাতা মুখে দিয়ে বসে ছিল—এখানে চা এবং মিষ্টির বন্দোবস্ত ক'রে রাখা হয়েছে। খেয়ে সকলে বাড়ী যাবে। বেরিয়ে এলেন ভূতনাথ-বাবু—গায়ে গেঞ্জি, সবল-স্বাস্থ্যবান মানুষ, পরণে কাঁচি ধুতি, খালি পা, মুখে-চোখে কালো রঙেও সেই পরিচ্ছন্ন মার্জনা, হাতে সিগারেট। এসে দাঁড়িয়ে বললেন—আসুন, সেখানে কষ্ট-টষ্ট হয়নি তো আপনাদের? শ্রীমান রূপলালের তো গুণের অবধি নেই। বড় হিসেবী লোক। আধ পয়সায় সিকি পয়সা কাটে।

ভট্‌চাজ্যিদের গোবিন্দপদ বললে—না-না। কষ্ট কিছু হয়নি।

—দাহ সুশৃঙ্খলে হয়ে গেছে ? ভাল হয়েছে ?

—একেবারে শেষ করে দাহ হয়েছে। সুন্দর পুড়েছে। ওদিকে নারানের পারঙ্গমও যেমন, তেমনি যত্নের সঙ্গে করে।

—গোসাঁই একটা মানুষ এখানকার মধ্যে। তারপর, ভাল তো গোসাঁই ? গত দুবার এসে দেখা হয়নি, শুনলাম গুরু-ট্রেনিং পড়তে গিয়েছ। খুব ভাল পাশ করেছ নাকি ?

হেসে নারান বলেছিল—তা করেছি। কবে এলেন ?

—কাল সন্ধ্যেবেলা।

বাড়ীর নায়েব এসে বললে—দিদি বললেন আপনাকে ভিতরে যেতে।

—ভিতরে ? চলুন।

বারান্দা থেকে ঘরের ভিতর ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—না। আমার যাবার প্রয়োজন নেই। ও আমি যা বলেছি—শেষ কথা। শ্রাদ্ধ বৃষোৎসর্গ করুন, দানসাগর করুন, তিলকাঞ্চন করুন,—কোন আপত্তি নেই আমার। খাওয়ান-দাওয়ান যেমন করবেন। আমার কথা—ধানের খাতকদের কাছে যা সুদ পাওনা আছে, সেটি সব ছাড়তে হবে। শুধু আসল নেওয়া হবে। বলবেন—তাতে কর্তার অক্ষয় স্বর্গ হবে। এ যদি হয়, আমি আছি। নইলে কুটুম্ব এসেছি, কুটুম্বের মত থাকব, তার বেশী কোন কিছুতে নেই।

নারান অবাক হয়ে গেল। মনে মনে নমস্কার করলে সে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ভূতনাথ হাঁকলেন—কই, এদের চা-জলখাবার কই ? চা কি আসাম থেকে আনতে গেছে ?

চা, জল খেয়ে মুগ্ধ হয়ে বাড়ী এল নারান। রায়বাড়ীর যে সম্পদ-সম্পত্তি মানুষকে, গরীবকে আইনের ফাঁক দিয়ে শোষণ করে জমা হয়েছে, সে সম্পদ, সে সম্পত্তি এবার একটি উদার মানুষের হাতে পড়ে মানুষের কল্যাণ করবে। শুধু নারান নয়, সারা গ্রামে, আশে-পাশের গ্রামে কথাটা ছড়িয়ে যেতে দেরি হল না। নারান ঠিক করলে—থানায় কানাইদেয় নিয়ে গিয়ে ওই মামলাটা যা হোক করে চাপা দেবে, বিচার করাবে এই লোকটিকে দিয়ে।

কানাইকে ডেকে সে বললেও সে-কথা। কানাই বললে—আপনি যা বলবেন তাই হবেন। আপনিই তো জোর গো।

বিকেলবেলা সে গেল রায়বাড়ী। কন্যা শ্রাদ্ধ করবেন। ত্রি-রাত্রির শ্রাদ্ধ। এখন অবশ্য সংক্ষেপেই হচ্ছে। পরে সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধের সময় বৃষোৎসর্গ হবে। তখনই বৃহৎ ক্রিয়াকর্ম যা হবার হবে। তবুও রায়বাড়ীর এই কৃতী সম্পত্তিশালী ব্যক্তির শ্রাদ্ধের সামান্য আয়োজন—অনেক। আশপাশ গ্রাম থেকে নানান্ ভদ্রজন এসেছেন। মাঝখানে বসে আছেন ভূতনাথবাবু। খালি পা—গায়ে চাদর। শ্রাদ্ধের কথাই হচ্ছিল। সে নমস্কার করে দাঁড়াল। তাকে দেখেই তিনি বললেন—এস গোসাঁই, বলো। অশৌচ—নমস্কার তো করতে নেই, কিছু মনে করো না। বসো। কথা হচ্ছিল কাঠের ; রান্নার জন্যে কাঠ। তেঁতুলগাছ কাটা হয়েছে। গাছটা একটা প্রকাণ্ড গাছ এবং বাড়ীর খিড়কীতেই গাছটা ছিল

—ভট্‌চাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকটা আড়াল করে নয়—অন্ধকার করে। বহু বলা-কওয়া, অনুরোধ, প্রতিবাদ করেও রায় ওটা কাটেন নি এতদিন। ওটাতে তেঁতুল হয় প্রচুর। এবার কাঠের জন্য ওটাকেই কাটিয়েছেন ভূতনাথবাবু রায়-কন্যার প্রতিবাদ সত্ত্বেও। ভূতনাথবাবু বলছিলেন —সংসারে তো তেঁতুলের অভাব নেই, অভাব যত মনের মিলের। তেঁতুল কিনলে মিলবে। এ তো দোকানে মেলে না। টকের বদলে মধুর ব্যবস্থা করলাম।

এরই মধ্যে শ্রীপতি গোমস্তা এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। কোথায় গিয়েছিল, ট্রেন থেকে নেমে আসছে। বগলে গামছ-বাঁধা একটা পোঁটলা। ভূতনাথ বললেন—ফিরলে? সব কাজ হয়ে গেল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সব জিনিস পেয়েছ?

—হ্যাঁ। দাম বেশী নিলে, তবে জিনিস ভাল। উত্তম জিনিস।

ডোমন আর পরান দুটো বড় বোঝা মাথায় নিয়ে হাজির হল এবার। একটু চকিত হল নারান। বুঝতে পারলে, জামিন নিয়ে ফিরছে ওরা এবং শ্রীপতি গোমস্তার সঙ্গেই যখন ফিরছে, তখন এর সঙ্গে কিছু যোগও আছে।

—যা, বাড়ির ভিতর নিয়ে যা। তারপর নারানের দিকে তাকিয়ে বললেন—দাঁড়িয়ে রইলে গোসাঁই, বসো। ওঃ, জায়গা নেই। তা—ওরে একটা কিছু আন।

—না-না, আমি এই দাওয়াতেই বসছি।

—না। তুমি লীডার লোক। মান্য তোমার প্রাপ্য। ওরে, আন কিছু। এই হারামজাদারা, শুনতে পাচ্ছিস না?

কাকে বললেন বুঝলে না নারান, তবে বুঝলে, ভূতনাথবাবু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন। এবং ঐ মানুষটির জাত আলাদা।

একটু অপেক্ষা করে সে হঠাৎ উঠে বললে—নমস্কার। আমি আজ যাই।

—না হে। বসো, বসতে বলছি বসো।

—আমার কাজ আছে।

—তোমার সঙ্গে আমার কাজ আছে। বসো।

—কি কাজ বলুন?

—বলব। বসো।

বসল নারান। ভূতনাথ ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এঁদের সামনেই বলব? আচ্ছা, তাই বলি। প্রথম ব্রাহ্মণ-ভোজনে পরিবেশনের ভার তোমার। ছেলে-ছোকরা-দের নিয়ে—

নারানের কপালে এতক্ষণ একটির পর একটি কুঞ্চন-রেখা ফুটছিল—এবার তার সব ক'টিই এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। সে হেসে বললে—নিশ্চয়। যা বলবেন তাই করব। দেখবেন—এতটুকু বিশৃঙ্খলা হবে না।

—তা জানি। তুমি মস্তবড় লীডার একজন। বাউড়ী-ডোম বাগ্দী—এরা তোমার কথায় ওঠে বসে। তা, কাল সব তাদের ডেকে ঘাসটাস চাঁচা-ছোলার কাজ করিয়ে দেবে। মুড়ি পাবে, ভাতের চাল পাবে—চারটে পয়সা পাবে।

—বেগার ?

—হ্যাঁ বেগার। শুনেছি—বেগার দেওয়া বারণ হয়েছে।

—তাই ওরা ঠিক করেছে।

—ওরা নয়, তুমি।

নারানের কপালের যে কুঞ্চন-রেখাগুলি মিলিয়ে গিয়েছিল, সেগুলি এবার একে-একে নয়, এক মুহূর্তে একসঙ্গে জেগে উঠল। বুকটা দ্রুত স্পন্দনে স্পন্দিত হতে লাগল—মাথার মধ্যে একটা উত্তপ্ত কিছু যেন ঘুরছে বলে অনুভব করল। কান দুটো তখন গরম হয়ে উঠেছে। এতগুলি লোকের দৃষ্টি যেন তাকে ছুঁচের মত বিঁধছে বলে মনে হল তার। সে প্রাণপণে নিজেকে স্থির রেখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেই বললে—সে কি আমি অন্যায় করেছি ? 'বাবু' বলা সে তখন ছেড়েছে, কিন্তু কি বলবে বুঝতে পারলে না। একটু থেমে সে আবার বললে—অন্ততঃ আপনার কাছে এটা শুনব আশা করি নি।

—কেন ? তোমার কথায় হাঁস মারব না বলেছিলাম ?

—হ্যাঁ।

—হাঁস আর মানুষ এক নয় গোসাঁই। হাঁস বুনো জাত। তাদের নিয়ে ঘর করতে হয় না। তাদের গুলি না ক'রে টিন বাজালেও পালায়। মানুষ নিয়ে ঘর করতে হয়। শোন, বড়লোকে গরীবদের চুষে খায় এও যেমন আমি পছন্দ করি না, তেমনি গরীবরা ভদ্রলোকের, সম্ভ্রান্ত লোকের অপমান করে মাথার উপর দিয়ে চলতে চায়—এও আমি পছন্দ করি না। যাদের জ্ঞান আছে, তারা কেউ করে না।

—তারা কারুর অপমান করে না, আর মাথার উপর দিয়েও যেতে চায় না।

—চায়। কানাই বাউড়ী তাই গিয়েছে। রায়বাড়ীর মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে। আর, লীডার সেজে তুমি তাদের যেতে বলেছ।

—রায়বাড়ীর চাকর চোর হলে তাকে ধরে থানায় দেওয়া আর রায়বাড়ীর মাথার উপর দিয়ে যাওয়া এক কথা ?

—জিজ্ঞাসা কর পাঁচজনকে। কি বলেন তাঁরা। সমস্ত লোকের আজ চলতে বিপদ হয়েছে রাখাল মান্দের নিয়ে।

—যদি হয়ে থাকে, তবে দশজনের তাতে সুবিধে হয়েছে। দশজনের কেন বিশজনের।

—বিশজনের না-হোক তোমার হয়েছে।

—আমার ? না।

—ভাল ক'রে ভেবে দেখো। তুমি যা উপকার তাদের করছ, তার থেকে পাঁচজনে অনেক বেশী উপকার করে তাদের।

—উপকার? হাসলে নারান।

—নয়? যার নেই তাকে দেয় না পাঁচজনে? তুমি যখন এসেছিলে তখনকার কথা ভাব।

—আমি কিছু করি নি?

—তুমি করলেই আমাকে করতে হবে; মানুষ কেন—জানোয়ারেও তা ক'রে পোষ মানে। শোন—পোষা জানোয়ার বদমেজাজী হলে তাকে মানুষ বেচে দেয়। শেষ পর্যন্ত মারে। ওদের বদমেজাজ ক'রে দিয়ো না।

—ভেবে দেখব। বলে সে উঠে চলে এসেছিল, আর দাঁড়ায় নি।

বাড়ী এসে যত ভেবে দেখেছিল কথাগুলো, ততই তার অন্তর বিদ্রোহ করে উঠেছিল। তারপর সে নিজে গিয়েছিল বাউড়ীপাড়া। সেখানে বসে অন্য পাড়ার লোকদেরও ডাকিয়ে এনে বলেছিল—দেখ তোরা ভেবে, কি করবি! যাবি বেগার দিতে?

কানাই বলেছিল—না। কিন্তু অপর সকলে চুপ ক'রে বসে ছিল মাথা হেঁট করে। চুপ ক'রে থাকাটা সংসারে সম্মতি-লক্ষণ বটে, কিন্তু তার সঙ্গে মাথা হেঁট করলে হয় উল্টো। নারান বুঝলে, ওরা তার দিকে তাকাতে পারছে না, লজ্জা হচ্ছে।

আবার সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি রে? বল!

এবার একজন বলেছিল—উনি তো এসেই ধানের বাকী ছেড়ে দিলেন গো। তার ওপর রায়মশায়ের কাজ বলে কথা। ছেরাদ্দ। রায়মশায় তো ফিরবেন না আর।

নারান চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—বেশ, যাবি।

কানাই বললে—আমি যাব না আজ্ঞে।

এরপর হয়তো মিটে যেত। সে তাই আশা করেছিল। কানাই সত্যিই যায় নি বেগার দিতে। অন্য সকলে গিয়েছিল। সে নিজে শ্রাদ্ধে যথাসাধ্য খেটেছিল। নারানের যথাসাধ্য কম নয়, অনেক। পরিবেশনের ভার সে-ই নিয়েছিল, ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ভোজন, সৎ শূদ্র-ভোজন শেষ হয়ে যখন গরীবের দল খেতে বসল, তখন রাত্রি দশটা। তখন ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কয়েকজন পালিয়েছে। বাকী সব বসে পড়ে বললে—আর পারছি না। তখনও নারান কাজ করছে। সে কিছু সৎজাতির ছেলে নিয়ে পরিবেশন চালাতে লাগল। পরিবেশনের মধ্যেই সে পড়ল আছাড় খেয়ে। একটা জায়গায় ডাল পড়ে পিছল হয়েছিল—একটা ভাতের বালতি হাতে হনহন করে যেতে গিয়ে পা পিছলে গেল। এবং এমন পড়ল যে, নারান যে নারান সে-ও কিছুক্ষণ উঠতে পারল না। কোমরে লেগেছিল তার। সেই আঘাত সামলাতে তাকে শুয়ে থাকতে হয়েছিল তিন দিন। প্রথম দিন নিজে এসেছিলেন ভূতনাথবাবু তাকে দেখতে। বাড়ী থেকে হোমিওপ্যাথিক বাক্স এনে তাকে আর্নিকা খাইয়ে গিয়েছিলেন। বাকী ক' দিন অজয় হাজরা এসে খোঁজ করে গেল ভূতনাথবাবুর হয়ে। সে বললে—ভূতনাথবাবু পাঠালেন। খাতাপত্র নিয়ে ব্যস্ত, আসতে পারলেন না। মনটাও ভাল নেই।

তার কাছেই শুনলে—ঢপের কীর্তন এসেছিল। তাই নিয়ে একটা অশান্তি হয়ে গেছে। বুঝলি না—শ্বশুরের সম্পত্তিতে সুখ নেই।

নারান হেসেই বলেছিল—তা ভাই, রায়-কন্যে নিশ্চয় রাগ করতে পারেন। ব্যাটাছেলের দল আনলেই পারতেন।

—ঢপের জন্যে আমরা ধরেছিলাম। বুড়োরা পর্যন্ত। উনিও তখন মত দিয়েছিলেন। ভূতনাথবাবু রসিক লোক। গান-বাজনা বোঝেন। ঝগড়া, ভূতনাথবাবু কেত্তনের পর ওদের বাসায় গিয়ে বৈঠকী গান শুনেছিলেন। একলা নয়—আমরাও ছিলাম।

অজয় হাজরাদের জানে নারান। সে হাসলে।

অজয় বুঝলে হাসির অর্থ। সে বললে—তাছাড়া ঝগড়া ও নিয়েও নয়। আসল ঝগড়া—ভূতনাথবাবু বলেছিলেন কাল স্ত্রীকে যে, রায়মশায়ের নামে একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা করা হোক। স্ত্রী বলেছিল—ওসব নয়, ওই শিবতলা বাঁধিয়ে দাও, আর মন্দির মেরামত করিয়ে মার্বেল ট্যাবলেট বসিয়ে দাও। ভূতনাথবাবু বলেছিলেন—পাড়াগেঁয়ে সেকেলে ওইসব ইয়েগুলো ছাড়। ব্যাস্, অমনি হয়ে গেল—হ্যাঁ শহরে আধুনিক মত হলে তোমার সুবিধে হয়। ঢপ আসে—ফুর্তি করা হয়। তারপর আর কি? আমার বাবার টাকা!

নারানের কোমরে সেঁক দেবার জন্য বুড়ী বিপিনের মা, তার ভিক্ষে-মা এসেছিল। অজয় বলেছিল—আমি উঠি।

নারান জিজ্ঞাসা করেছিল—আমার কথা কিছু বলছিলেন? অজয় বললে—এই তো আমাকে পাঠালেন। নারান ঘাড় নেড়ে বললে—না—সেই কানাই-টানাইয়ের কথা নিয়ে? অজয় হাসলে—কি বলবেন? মিটিয়ে নিলেই মিটে যাবে! চলে গিয়েছিল অজয় হাজরা। নারান ভাবছিল, মিটিয়ে নেবে। ভাবনাটা ভাবতে ভাবতেই মিটবার পথ বন্ধ হয়ে গেল। ডোমনাদের মামলার দিন এসে গেল। সেও সাক্ষী ছিল। আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা সে-ও বলতে পারলে না, কানাইরাও না। ডোমনের এক মাস জেল হয়ে গেল।

রূপলাল গোমস্তা সঙ্গে সঙ্গে আপীল করে জামিনে খালাস করে তাদের সঙ্গে এককঙ্গেই বাড়ী ফিরল। এবং আস্ফালনের আর বাকী রাখলে না। কানাইরা এবং তাদের সঙ্গে সে চুপ করেই ফিরে এল। গ্রামে ঢোকবার সময়ে ঘুরপথে রায়বাড়ী এড়িয়ে অন্য পথে গাঁয়ে ঢুকল।

গোসাঁই বললে—না, নারান ভয় পায়নি। না। কানাইরা পেয়েছিল। পাবারই কথা। নারানের চক্ষুলজ্জা হয়েছিল। ভূতনাথবাবুর কাছে চক্ষুলজ্জা। লোকটি বিশ্রী মানুষ। সুদের ধান ছেড়ে দেয়, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা করতে চায়, সে তার বাড়ীতে পড়া কোমরে দরদ হয়ে পড়েছিল বলে নিজে দেখতে এসেছিল, ওষুধ দিয়ে গেছে। অজয়কে পাঠিয়েছে দেখতে। মিটমাট করতে করতে করা হল না।

* * *

তবু নারান ভাবছিল। মিটমাট কি করে হয়—এ নিয়ে চিন্তা সে করছিল। ভয়ে নয়,

ভূতনাথবাবুর বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। সে আকর্ষণে শুধু অজয় হাজরাই আসে না, ধনদাবাবু আসেন, শিবু ডাক্তারও আসে। দু-একদিন হীরালালবাবুর আসার খবরও পেয়েছে সে।

তখন বিয়াল্লিশের প্রথম। জানুয়ারীর শেষ। ডোমনের জেল হয়েছে। বাউড়ীরা দল ভেঙেছিল, আবার জোট বাঁধছে। খবরের কাগজে কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি নিয়ে নানান্ জল্পনা-কল্পনার কথা বেরুচ্ছে। যুদ্ধের কালোমেঘ পুব দিকে সাইক্লোনের চেহারা নিয়ে শন্ শন্ করে উঠছে। ভূতনাথবাবুর কাছে কাগজ আসে হিরণহাটি থেকে। হিরণহাটিতে কাগজের এজেন্সী হয়েছে, সেখানে কলকাতার সকালের কাগজ বেলা দুটোয় আসে, ভূতনাথবাবুর লোক সে কাগজ নিয়ে আসে। তাই নিয়ে আলোচনা হয়। নারান যেতে পারে না। সে নিত্য দুপুরে যায় হিরণহাটি, সেখানে বাজারের কাগজ পড়ে আসে।

জীবনে একটা অস্বস্তি এসেছিল। ধনদাবাবু তাকে ডেকেছেন, সে যায়নি। শিবু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ডাক্তার বলেছিল—বড় ভাল করছ গোসাঁই। আমার ওখানে যেয়ো না! অনেক কথা আছে। বুঝছ তো—একটা মহামারণ ঘটবে এইবার।

তবু সে যায়নি।

একটা নেশা। একটা নেশা তাকে ধরেছিল।

মাঠে চাষ করতে করতে তেষ্টা পায়। হয়তো জমিতে টানাটানি জল—চাষটা কোনরকমে সেরে পুঁতে না ফেললে সব খারাপ হয়ে যাবে, সে সময়ে ক্ষিধে মনে থাকে না—কিন্তু তেষ্টা মানে না; লাঙল থামিয়ে সামনের দিকে ছোটে, ওই চাষী-বউ দূরে খাবার জলের ঘটি নিয়ে আসছে।

নারানের জীবনে সেই সময়টায় সেই তেষ্টা পেয়েছিল। হিরণহাটিতে সে শুধু কাগজ পড়তে যেত না, ট্রেন দেখত। ট্রেনে দেখতে মেয়েদের মুখ। যতদূর মনে পড়ে—কালো সুন্দর মাঝারি দেখতে যেমনই হোক—সে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দেখত।

পাপ কামনা—? না। না—নয়ই বা কেন, আংশিক বটে। পুরো নয়, সে বলতে পারি। বিয়ের কল্পনা করত। বিয়ের জন্যে অনেকেই তাকে তখন বলছিল—নারান, এর একটি মেয়ে আছে রে,—বলছিল—তুই যদি বিয়ে করিস। তখন কাল পাল্টেছে—বিয়েতে টাকা লাগবার কথা নয়। আর, তার রোজগার তখন সামান্য বটে, কিন্তু ওই সামান্যতে তাদের ও অঞ্চলে সবাই বিয়ে করে। কিন্তু বিচিত্র কথা—বিয়ের কথায় মন সায় দেয় না। মনের সামনে এসে দাঁড়ায়—তার দেখা মার্জিত রুচির আধুনিকা মেয়েদের মুখ, তারা তাকে বারণ করে। শুধু তাই নয়—গ্রামের কয়েকটা ব্রাত্য স্বৈরিণী মেয়ে তার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে তখন আকর্ষণ করতেও চেষ্টা করে। ওই কানাইয়ের একটা মেয়ে শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল—দেখতে মেয়েটার মধ্যে একটা লালসা জাগানো কিছু ছিল, কি তা বলতে পারব না, নারান তার দিকে ভালো করে তাকায় নি। নাম ছিল—সুরো, সুরধুনী কি সুরবালা,

তা জানতে চেষ্টা করেনি সে। কানাইয়ের সম্পর্ক ধরে সে ছুতোয়-নাতায় প্রায় আসত। হাসত। রসিকতা করবার চেষ্টা করত। আরও কয়েকটা মেয়ে—তারা সন্ধ্যেবেলা ইচ্ছে করে বিলের ধারে যেত, নারান যেখানটিতে বসে থাকত বিলের দিকে তাকিয়ে—ওই মানিক-জোড়দের দেখত, ওই হাঁসেদের দেখত, সেইখানটার কাছাকাছি ঘুরত; জমি থেকে দুটো ছোলার শাক কি কলমী-শুষনীর ডগা খুঁটে খুটে তুলে আনত। তুলত আর গলা মিলিয়ে একসঙ্গে গান করত। ওদের পুরুষরাও থাকত, মাঠে কাজ করত; তাদের সামনেই তার দিকে তাকাত, কটাক্ষ হানত, রসিকতা করত; তার সঙ্গেও বটে, নিজেদের মধ্যেও বটে। কিন্তু পুরুষদের ওসব গা-সওয়া; কতকাল ধরে সয়ে সয়ে এটাতে ওরা প্রতিবাদের বা শাসনের কিছু দেখতে পেত না। তার উপর নারানের উপর বিশ্বাস ছিল তাদের। হয়তো বা তাদেরও লোভ ছিল—এই ঠাকুরটিকে একটু বেশী আপনার করে পেতে।

নারানের বয়স তখন বাইশ-তেইশ। লম্বা গৌরবর্ণ, সবল শক্ত দেহ, বুকের প্রশস্ত ছাতি, মাথায় লম্বা চুল; মেয়েদের দেখে পুরুষের তৃষ্ণা জাগে, হিসেবমত নারানের ধারণা—মেয়েদেরও তাকে দেখে তৃষ্ণা জাগত। কিন্তু ওদের প্রতি তৃষ্ণা জাগতে পেত না নারানের, ট্রেনে দেখে আসা কোন একটি সুন্দর মুখ তার মনে জেগে থাকত। তাছাড়া প্রতিষ্ঠার পুণ্যে বাঁধন। তাকাতে গেলেই বাঁধনটা যেন কষে যেত—পীড়া দিত তাকে।

থাক, হয়তো বেশী বকছি। বেলা দেখে গোসাঁই বলেছিল—বেলা ফুরিয়ে আসছে। সুয্যিঠাকুরের মেসিন—ও তো মাপ করা, একটু বাড়াও বললেও বাড়াবে না।

৬ই ফেব্রুয়ারীর কথা বলছিল—।

৬ই ফেব্রুয়ারী ট্রেন দেখবার জন্যে স্টেশনে সে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখে পড়ল আশ্চর্য সুন্দর একটি মেয়ে। তার চোখে লাগল আশ্চর্য সুন্দর। যেমন রূপ, তেমনি রুচি। ইণ্টার ক্লাসে যাচ্ছিল। নারান লোলুপের মত দেখছিল; চমক ভাঙল গার্ডের হুইসিলে। তারপর যা করলে, তা নিজেও জানত না যে, সে তা করতে পারে। টিকিট-চেকারের কাছে ছুটে গিয়ে বললে—আমি এই ট্রেনে যাচ্ছি, টিকিট কাটা হয়নি, ট্রেনে নেবেন। জংশন যাব। ইণ্টার ক্লাসেই উঠে বসল সে। জংশন পর্যন্ত তাকে দেখতে দেখতে গেল। সে-মেয়ে তার স্বামী এবং বোধহয় ননদের সঙ্গে কথা বলছিল—তার দিকে তাকালেও না। না তাকাক, ক্ষতি নেই নারানের, সে দেখতে দেখতে গেল।

জংশনে হঠাৎ যেন নাটক হয়ে গেল। কলকাতার ট্রেন থেকে নামল বিশ্ববন্ধু।

বিশ্ববন্ধু বললে—তুই? সে-ও বললে—তুই?

এরই মধ্যে সে মেয়েরা ওই ট্রেনে চলে গেল। বিশ্ববন্ধু বললে—কাজ আছে সদরে। সেক্রেটারিয়েট থেকে স্পেশাল মেসেঞ্জার হয়ে কাগজ নিয়ে আসছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেবে। বললে—ওরে, ভালই হল, তোর সঙ্গে দেখা হল। খুব সাবধান ভাই। দেশ জুড়ে যা হবে, তা ভাবতেও প্রাণ শিউরে ওঠে। বার্মা চলে গেছে, আমাদের প্রভুরা হটছেন—একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে। এদিকে দেশে—। চুপ করে গেল সে। তার

মনে ছিল প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। এ-কথায় ছেদ টেনে বলেছিল—কিন্তু, তুই কোথায় এখানে ?

সে বিশ্ববন্ধুকেও মিথ্যে কথা বলছিল। বোধহয় বলা যায় না এই কথা কোন মানুষকেই। সে বলেছিল—ভাই, ভাল লাগছিল না কিচ্ছু। ভারী খারাপ লাগছিল, তাই চড়ে বসলাম ট্রেনে। যাই, জংশনে মেন লাইনের ট্রেন দেখে আবার সন্ধ্যের সময় ফিরে আসব।

বিশ্ববন্ধু বলেছিল—চল, আমার সঙ্গে চল, আজ সন্ধ্যেতে কাজ সেরে রাত্রিটা ওখানে থাকব ডাকবাংলোতে, কাল সকালে আমি চলে যাব কলকাতা, তুই যাবি বাড়ী—।

তাই করেছিল সে। বিশ্ববন্ধুর সঙ্গে সদরে গিয়েছিল। সন্ধ্যের পর থেকে অনেক গল্প করেছিল। বিশ্ববন্ধু তাকে বার বার বলেছিল—দেখ্, তুই অনেক ভাল কাজ করিস। মন্দ ভেবে কোনটা করিসনে আমি জানি, বিশ্বাস করি। তবু এ-পথ কাদের জানিস ? যারা সারাটা জীবন পুড়তে পারবে, তাদের।

সে বলেছিল—হুঁ। তা তো বুঝি। কিন্তু—

বিশ্ববন্ধু প্রশ্ন করলে—কিন্তু কি ?

—থাকতে পারি না যে। আমার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আচ্ছা তুই বল —ওইভাবে চোখ রাঙাবে আর তাই সইতে হবে ? একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিল —বেশ, তুই মিটিয়ে দে।

—দোব। আমি এবার যখন বাড়ী আসব, তখন নিশ্চয় দোব। লোকটিরও দোষ আছে, আবার গুণও আছে। করিয়ে নিতে পারলে অনেক কাজ হবে। তাছাড়া—

—কি ?

—বড় দুঃসময় আসছে রে। ও যা করবে করুক, বড়লোকের জামাই—সামলাবে। কিন্তু তুই—আমি বুঝতে পারছি নারান, তোকে তো জানি—একটা ঝোঁকের মাথায় যা-তা করে নিজেকে শেষ করে ফেলবি। নারান, ভী-ষণ সময় আসছে।

পরদিন বাড়ী ফিরল সে। ফিরেই দেখল—ভীষণ সময় তারই ঘরের উঠোনে এসে হাজির হয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে তার। পুলিশের দারোগা বসে আছে, দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে রূপলাল। আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের কিছু লোক, বাউড়ীরা, বিপিন ; বিপিনের মা বসে আছে তার দাওয়ায়।

খবরটা সে পেয়েছিল স্টেশন থেকে গ্রামে ঢুকবার পথেই। সুরো—কানাইয়ের মেয়ে —ছুটছিল হিরণহাটির দিকে। কানাইয়ের বাড়ীও সার্চ হয়ে গেছে। সে তারই খবর নিয়ে যাচ্ছিল কানাইয়ের মনিব হিরণহাটির চালের ব্যবসাদার দত্তমশায়কে দিতে। কানাই এখন তার দোকানে চাল-ধান বয় গাড়ীতে। সে থমকে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে বলেছিল—ঠাকুর, তুমি পালাও। বাড়ী যেয়ো না। সবিস্ময়ে সে বলেছে—কেন ? সুরো বলেছিল—থানা পুলিশ তোমার বাড়ীতে। রূপলাল গমস্তা নিয়ে আইচে ডেকে।

থানা পুলিশ রূপলাল ডেকে এনেছে তার বাড়ীতে! মাথার মধ্যে মুহূর্তে আগুন জ্বলে

উঠেছিল। সে হন-হন ক'রে গ্রামের দিকেই ছুটেছিল। সুরো—বলেছিল ঠাকুর। বাবাকে ধরেছে। তুমি আর যেয়ো না।

নারান তা শোনেনি। ভয়ের কোন কথা তো নেই তার। তার উপর তার ক্রোধ। সে নির্দোষ, সে সৎ। তার সুনাম আছে। তার সম্পত্তি নেই, টাকা নেই—কিন্তু তার মান আছে। দুনিয়াতে টাকার জোরে পাষণ্ডেরা এই অত্যাচার করবে, আর সে তাই সইবে।

বাড়ী এসে ঢুকেই সে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল—কি? কী ব্যাপার আমার বাড়ীতে?

—চোর। এই চোর। আমি রাত্রে বাইরে উঠেছিলাম—পুকুরপাড় দিয়ে চলে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কে? সাড়া দিলে না। চলে গেল। সে ওই। ওই চুরি করেছে। রূপলাল গোমস্তা বলে উঠল।

নারান যা করলে, সে নিজেও তা ভাবেনি। জীবনে কখনও মাথায় আগুন জ্বলেছে আপনার? জ্বললে বুঝতে পারতেন। নারান এক চড় মেরে বসল রূপলালের গালে। প্রচণ্ড চড়। 'বাপ' বলে বসে পড়ল সে, মুখখানা রক্তাক্ত হয়ে গেল। দুটো দাঁত ভেঙে পড়েছে। চীৎকার ক'রে উঠল। মিথ্যেবা-দী?

দারোগা হেঁকে উঠল—পাকড়ো, এই—। সঙ্গে সঙ্গে একটা কনস্টেবল ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। নারান তখন জ্ঞানশূন্য, সে তাকেও মারলে এক ঘুষি। তখন আরও একজন কনস্টেবল তাকে এসে ধরেছে। কিছুক্ষণ পর তার সম্বিৎ ফিরল। এতক্ষণে সে জানতে পারলে—রায়েদের ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুরের গহনা চুরি হয়েছে। ঠাকুরের গহনা, শালগ্রামের সোনার পৈতে, সোনার ছাতা, রূপোর সিংহাসন।

রূপলাল গোমস্তা বলেছে—সে রাত্রে বাইরে উঠেছিল, পুকুরপাড়েই যাচ্ছে; পুকুরটা ঠাকুরবাড়ীর খিড়কী। সে দেখেছে একজন লোক চলে যাচ্ছে পুকুরপাড়ের পাশের রাস্তা ধরে। সে ডেকেছিল—কে? কে? লোকটি সাড়া দেয়নি। রূপলালের দৃঢ় ধারণা, সে নারান গোসাঁই। অন্ধকার রাত্রি—তবু তার চলন-গড়ন দেখে চিনেছে।

তাছাড়া শালগ্রামের পৈতে, তার সিংহাসন, ছাতা—এ ব্রাহ্মণ ছাড়া কে নেবে? শূদ্রে কি স্পর্শ করতে পারে? পারে না। পারা সম্ভবপর নয়। এক, অন্য ধর্মাবলম্বী চোর চুরি করতে পারে—কিন্তু সে শালগ্রামটিকে পাশে নামিয়ে রেখে যাবে না। তাহলে সে ওটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেতো। কিম্বা আছাড় মেরে ভেঙে দিত।

এ চোর ব্রাহ্মণ। এবং সে চোর ব্রাহ্মণের ঘরের নাস্তিক কালাপাহাড়—নারান গোসাঁই।

ভূতনাথবাবু নাকি বলেছিলেন—আমি কোন কথা বলতে পারব না। বুঝতে ঠিক পারছি না। তবে রূপলাল বলছে, তাই বা অবিশ্বাস করি কি ক'রে? পুলিশ যা হয় করুক।

পুলিশ রূপলালকে নিয়ে এসে ঘরের দরজা বন্ধ দেখে তার অপেক্ষা করছিল। কানাই বাউড়ীর বাড়ীও তল্লাশ করেছে পুলিস। কারণ, কানাই নারান গোসাঁইয়ের অনুগত লোক।

নারানের মাথার চুল তখন উস্কোখুস্কো। চুল ধরে তাকে টেনে তুলেছে, সরিয়ে এনেছে কনস্টেবল। সে তবুও দৃপ্ত। বুক তার তখনও জ্বলছে।

একটু থেমে গোসাঁই বললে—আগুন নারানের বুকে কবে লেগেছে—তা নারান জানে না। হয়তো হৃদয়ের বাড়ী থেকে লেগেছে। হয়তো গাঁয়ে এসে গ্রামের লোককে ভালবাসতে গিয়ে তাদের মনে তাদের অঙ্গে মৃদু উত্তাপের স্পর্শ দিতে, ঘরে উনোনশালে ভালবাসাকে পাক করতে আবেগের আগুন জ্বেলেছিল, লোকে সেটাকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলে—সেটা উনোনের আগুন থেকে ঘর-জ্বালানো অগ্নিকাণ্ড হয়ে বুকের ঘরে লেগে গেল। ওই দিনই বোধ হয় লাগল। হয়তো বা নিজেও সে ছিটিয়েছিল। এই বাউড়ীদের নিয়ে দল বাঁধতে গিয়ে অসাবধানে জ্বলন্ত আগুন ফেলেছিল—সেটা লাগল। জ্বলল।

নারান জ্বালায় জ্বলন্তের মতই বলেছিল—কাল বিকেল থেকে আমি গ্রামে ছিলাম না। কাল পাঁচটার ট্রেনে গিয়েছিলাম জংশন। সেখান থেকে সদর শহর। আজ সকালে সেখান থেকে দশটার সময় হিরণহাটিতে নেমেছি। আমাদের গ্রামের সরকারী চাকুরে বিশ্ববন্ধু আমার সাক্ষী। তার সঙ্গেই কাল রাত্রি কাটিয়েছি। আমি চোর!

গোসাঁই বললে—চোর নারান নয়, চোর অপবাদ তার টেঁকে নি। কিন্তু নারান অধীর, নারান ক্রোধী। মানুষের উপকার করার যে আনন্দের স্বাদ তাকে মাতিয়েছিল, সেটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে তখন প্রমত্ত করেছে। তাছাড়া—হেসে গোসাঁই বললে—মানুষকে চোর সন্দেহ করলে অপরাধ হয় না—সাধুকে বললেও হয় না। কিন্তু সাধুর তার প্রতিবাদে কোন শাস্তি দেবার অধিকার নেই। দিলে অপরাধ হয়।

নারানেরও হল—রূপলালের দাঁত নড়াই ছিল, তবু দাঁত ভাঙলে হাড় ভাঙার অপরাধ হয়; তার উপর কনস্টেবলকে মেরেছিল। সরকারী কাজে বাধা দেওয়া হয়েছিল। দুই অপরাধে তার জেল হয়ে গেল দেড় বছর!

পাঁচিল-ঘেরা জেলের মধ্যে বুকের আগুন জাগিয়ে সে বসে রইল।

* * *

১৯৪২ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। তা একরকম ভালই হয়েছিল—নইলে আগস্ট আন্দোলনেই গুলি খেয়ে মরত। নয়তো সেপ্টেম্বরের বানে ভেসে যেত, নইলে অক্টোবরের সাইক্লোনে বাউড়ীদের বাঁচাতে গিয়ে গাছ চাপা পড়ে মরত। সেবার নদীতে প্রবল বান হয়েছিল। বিপিনের ঘর ভেঙেছিল—তার ঘরের দেওয়াল ভেঙেছিল, বাউড়ীপাড়াটা তিন দিন ডুবে থেকে পরিণত হয়েছিল মাটির স্তূপে। দু'তিনটে বাচ্চা, একটা মেয়ে ভেসে গিয়েছিল। ওরা বসেছিল চালের উপর। মজার কথা কি জানেন—আগে পাড়ায় বান ঢুকলেই ওরা ঘটিবাটি, মাটির হাঁড়ি, ছেঁড়া কাঁথা, গরু-বাছুর নিয়ে ভদ্রলোকদের পাড়ায় গিয়ে ঢুকে আনাচে-কানাচে গোয়ালে, চালায় আশ্রয় নিত। এবার তা যায়নি। কারণ জানেন? ওই নারানের ছড়ানো বিষ বা অমৃত যাই বলুন। ওদের

জোটটা আবার বেঁধে উঠছিল। উঠছিল—আগস্ট আন্দোলনের হাওয়া বা উত্তাপে।

গোসাঁই বললে—কালের কথা বলছি এর আগে, কাল এক-একটা সময় এমন চেহারা নেয় যে, তার মধ্যে মহাকালকে প্রত্যক্ষ করা যায়। দুনিয়াসুদ্ধকে এক করে এক মহাকালই দিতে পারে। খণ্ড কাল পারে না। সে শুধু কাঠ পাতা জড়ো করেই যায়, মহাকাল তাতে আগুন লাগিয়ে মাটি থেকে আকাশ আগুনে-আলোয়, উত্তাপে-ধোঁয়ায় এক ক'রে দেয়। শুধু ঘাস পোড়ে না—বন পোড়ে, গাছ পোড়ে—কীটপতঙ্গ জন্তুজানোয়ার সব পোড়ে।

উনিশশো বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন তাই। পৃথিবী-জোড়া যুদ্ধ এগুতে এগুতে বার্মা হয়ে চট্টগ্রাম ফেণীর ধারে এসেছে—উপরে কোহিমা মণিপুর। এ দেশ কাঁচা ঘাস আর সবুজ পাতার বন হয়ে ঠাণ্ডা বাতাসে হেলতে দুলতে পারে। তাতেও আগুন লাগল। আগস্ট আন্দোলন হয়ে লাগল। তাতে ওই বাউড়ীগুলো দুব্বো ঘাস হলেও ওরাও জ্বলল। না জ্বলুক, আগুনের আঁচে শুকনো হয়ে ডাব পাকিয়ে গেল। ওরা বানের সময় গেল না। কিন্তু সাইক্লোনের সময় গেল। ওরা বানের পর ঢিবির উপর বাঁশের কাঠামোর চালা করে তালপাতা দিয়ে ছাইয়ে বাস করছিল। সাইক্লোনের সময় সে তালপাতা প্রথমেই উড়েছিল। নারান বাইরে থাকলে—নিশ্চয় যেত ওদের ওখানে—কি করত তা জানে না, তবে যেত। কারণ, না গেলে অন্য ভদ্রলোকেরা এসে নিয়ে যেত। মানুষ সবাই। মানুষ আসে। কিন্তু বিপন্ন মানুষের আনুগত্য পাবার লোভও আছে। অজ্ঞাতে আছে। নারান সবার আগে যেত—হয়তো গাছচাপা পড়ে মরত। জেলখানায় সে বেঁচে রইল। কিন্তু ভেবেছিল বাউড়ীদের কথা—শুধু বাউড়ী কেন, গ্রামের কথাও ভেবেছিল। ভাবতে পারে নি কেবল রায়বাড়ীর কথা, আর রূপলালের কথা। না, সে ভাবে নি। আক্রোশ। আক্রোশ। আক্রোশ তার জমে ছিল, জমছিল। মধ্যে মধ্যে উদ্বেগ হত—ওই ভূতনাথের কাছে গিয়ে ওরা শেষ পর্যন্ত গড়িয়ে পড়বে। পড়ত। কিন্তু তার আগেই সাইক্লোনের দ্বিতীয় দিন মহাষ্টমীর সকালে সে গিয়ে ওদের ডেকে নিয়ে এসেছিল—খাইয়েছিল, থাকবার জায়গা ক'রে দিয়েছিল। ওরা হরিবোল দিয়ে হরির জয়ধ্বনি দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে রায়বাড়ীর জয়ধ্বনিও দিয়েছিল। রাত্রিকালে আবার ওদের ক'টা স্বৈরিণী মেয়ে রায়বাড়ীর চাপরাসী গোমস্তার সঙ্গে ফিসফাসও করেছিল। ওরা উচ্চবাচ্য করে নি। রায়বাড়ীর অন্দরে কর্তা-গিন্নীতে কথান্তর হয়েছিল। গিন্নী বলেছিলেন—এ কি হচ্ছে? এ যে ছুঁতপবিত্র রইল না, একাকার হয়ে গেল। যেখানে-সেখানে ছেলেগুলো বেড়াচ্ছে। মেয়েগুলো হি-হি করে হাসছে।

কর্তা বলেছিলেন—হলই বা—কত বড় বিপদ, আর মানুষ তো!

—না। যা নিয়ম, তা ভাঙতে দোব না। কিছুতে না। অন্য পূজো নয়—দুর্গাপূজো! ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়েছিল ব্যাপারটা। শেষরাত্রে মদ্যপান ক'রে ভূতনাথ একজন বাউড়ীকে প্রহার করেছিলেন। লোকটা মূত্র-ত্যাগ করেছিল মন্দিরের এলাকার মধ্যেই।

জেলখানায় নারান ছিল সাধারণ কয়েদী। রাজনৈতিক কয়েদীদের এবার বিশেষ বিশেষ জেলে রাখা হয়েছিল, তাদের সঙ্গ সে পায় নি। তাদের ওখানকার ধনদাবাবুকে ধরার খবর

পেয়েছিল—হিরণহাটির বিধু ডাক্তারকে ধরেছিল পুলিশ—কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি তার। হীরালাল দাশগুপ্ত ফেরার হয়েছিলেন। কালীপদ ভার্গব, শিবু ডাক্তার শুধু বাইরে ছিল। তাদের দল এতে নামে নি।

নারান অন্যদিনের মত সেদিন, অর্থাৎ মহাষ্টমীর রাত্রে সাইক্লোনের গোঙানীর মধ্যে তাদের সঙ্গেই ছিল—অন্য দিন তারা নিজের নিজের গল্প করে, চোর চুরির কথা, ডাকাত ডাকাতির কথা—ঘটিবাটি চোর খুব হেসে ঘাট থেকে ঘটি তোলার কথা বলে। নিজের নিজের ঘরের কথা বলে। নারান কথা বলে না—ভাবে। সেদিন কয়েদীরাও পৃথিবীর জন্যে ভেবেছিল—সে ভেবেছিল। ওদের জীবনে একটা সহজ স্বচ্ছন্দ আনন্দই থাকত—অন্য দিন তার থাকত আক্রোশ। এই দিনটিতে এক হয়ে ছিল।

আর হয়েছিল যেদিন কলকাতায় বোমা পড়ার খবর আসে, সেই দিন। খুব খুশী সকলে সেদিন। সেও খুশী হয়েছিল। মহাকালের চেহারা, মহাকালের হাওয়া জেলখানার পাঁচিল ডিঙিয়ে আসে।

বিপিনকে সে পত্র দিত। বিপিন উত্তর দিত। মাসে একখানা। তাতেই খবর পেত। বিপিন সব চিঠির জবাব দিত না। তেতাল্লিশের প্রথমে সে সংবাদ দিলে—'দেশে মড়ক লাগিয়াছে। গত বৎসর ধান একেবারেই হয় নাই। এক মাস দু-মাসের খোরাক—তাও না। লোকের কি অসুখ হইতেছে—বুঝা যাইতেছে না। পড়িতেছে মরিতেছে। অনেক বসিয়া বসিয়া মরিতেছে। ধান কেবল রায়বাড়ীতে। দিতেছেও তাহারা। কিন্তু লোকে লইতে চাহিতেছে না।' তারপর কি লিখেছিল—খুব যত্ন করে কেটেছে নিজেই—কারণ, লাইনটা পুরো লাইন নয়, কয়টা শব্দে একটা অসমাপ্ত লাইন।

তারপর একখানা চিঠি এল ফেব্রুয়ারী মাসে—তোমার দিদি লক্ষ্মী মারা গিয়াছে।

নারান খুব আঘাত পেয়েছিল। মর্মান্তিক। বার বার মনে হয়েছিল তার বীরেনের কথা। দিদির ওই একটিই ছেলে বেঁচে আছে, তার পর তিন-চারটি ছেলে হয়ে আঁতুড়েই মারা গেছে। হৃদয় বিয়ে করবে সে জানে। বীরেন? তার কি হবে? ঠিক পরদিন হৃদয়ের পত্র পেয়েছিল সে। হৃদয়ও তাকে দিয়েছিল কি মনে ক'রে, লিখেছিল—ভাই নারান, তোমার দিদি আমাকে অকূলে ফেলিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। আমি আতান্তরে পড়িয়াছি। বীরেনের মুখ দেখিয়াই বুক ফাটিয়া যাইতেছে।—সে অত্যন্ত বিষাক্ত হাসি হেসেছিল।

* * *

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গোসাঁই বললে,—মমতা বড় পবিত্র বস্তু, বাবু। মন প্রাণ মমতার সুখেও বটে দুখেও বটে—মানুষকে বদ্‌লে দেয়। যেমন মানুষ হোক—সাধুই হোক আর পাপীই হোক—বদ্‌লে, একরকম করে দেয়। কেমন জানেন—কাগজের ফুল ম্যাজিকে যেমন আসল ফুল হয়ে যায়, তাই হয়। নারানও এই মমতার মধ্যে জেলে বাকী ক'টা দিন যেন আসল ফুল হয়ে গিয়েছিল। একটু ফুটে শুকিয়ে ঝরে যায়, মধ্যে মধ্যে ভাবনাটা ভোলে—আবার হঠাৎ দিদিকে মনে পড়ে, বীরেনকে মনে পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কুঁড়ি দেখা

দেয়, আস্তে আস্তে ফোটে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, বীরেনের এখন কি অবস্থা, ভাবে। বুকের আগুনটা জল হয়ে যায়। আবার হৃদয় বিয়ে করেছে বা করবে কল্পনা করে তার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে সে বাড়ী যায় নি। গিয়েছিল দিদির বাড়ী। দীর্ঘকাল পর গ্রামের মুখে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। এসেছিল সে স্টেশন থেকে হেঁটে। গ্রামখানা দেখে শিউরে উঠেছিল। প্রথমেই চোখে পরেছিল নদীর ভাঙ্গন। ভাঙ্গনটা ভল্লাপাড়ার ধার পর্যন্ত চলে এসেছে। বেলা তখনও ছিল—অপরাহ্ণ বেলা। সেই নদীর ধারের গাছপালাগুলোর কি অবস্থা। তবে ওরা বীর বটে। বড় অর্জুন গাছ উল্টে পড়েছে—দুটো একটা শিকড় লেগে আছে—ডালাপালা শুকিয়েও মরেনি—দু-চারটে কচি ডাল বেরিয়েছে, তাতে কিছু পাতা বাতাসে দুলছে। অশথগাছ সমূলে উপড়েছে। বটগাছ জরাসন্ধর মত দুফালি হয়ে গেছে, কিন্তু দুফালিই বেঁচে আছে। লম্বা গাছগুলো মাঝখানে ভেঙ্গে কবন্ধের মত হয়ে গেছে। ঘাস নেই, বন্যার বালিতে চাপা পড়েছে। ভল্লাপাড়ায় ঢুকল নারান—কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারলে না। যারা আছে, সব যেন ধুঁকছে। ক'জন কঙ্কালসার পুরুষ সেই গাছতলায় বসে ছিল। গাছটার অনেক ডাল ভেঙেছে। ছায়ার পরিধি সংকীর্ণ হয়েছে। তারা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে নারানের মুখের দিকে চাইলে। জেলখানায় ধরাবাঁধার মধ্যে থেকে খেয়ে নারান আরও সবল হয়েছে, সুন্দরও হয়েছে দেখতে। রংটা গৌরবর্ণ, সেটা আরও ফরসা হয়েছে তখন। নারান জিজ্ঞাসা করলে, রাম কোথায়? রাম ভল্লা?

তারা আশ্চর্য হল।

রাম ভল্লা—সে তো অ্যানেক দিন গত হয়েছেন গো! গেল বছর। ঝড়ের সময় ডাল চাপা পড়েছিল। ক'টি মেয়ে ভেঙে-পড়া বাড়ীর ভাঙ্গা দাওয়ায় ঠেস দিয়ে মড়ার মত তাকিয়ে আছে।

সে আর প্রশ্ন করলে না। মন তার বীরেনের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। সেই দু-আড়াই বছরের বীরেনকে ফেলে সে চলে গিয়েছিল। আজ কত হবে? দশ-এগারো বছরের। কেমন হয়েছে? কত বড় হয়েছে? বাড়ী কাছেই হৃদয়ের। কই, কই? সেই উঁচু কোঠাটা? ওই যে ভেঙেপড়া তালপাতা দিয়ে ছাওয়ানো চাল—ওইটে? হ্যাঁ, ওইটেই তো।

হায় মহাকালের কোপ!

বাড়ীর সামনের দরজা ভাঙা। খোলা। সে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বুকটা যেন ধড়ফড় করছে। উঁকি মেরে সে চমকে উঠল। ঘৃণায় ক্রোধে মুহূর্তে মনটা কঠিন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ভাঙা দাওয়ায় একখানা শাড়ী মেলে দেওয়া রয়েছে। শাড়ী! তা হ'লে—! তবুও আত্মসম্বরণ ক'রে সে ডাকলে—হৃদয়দা!

আবার ডাকলে—হৃদয়দা! বীরেন!

মেয়ে-কণ্ঠে কে সাড়া দিলে—কে?

নাম বলতে ইচ্ছে হ'ল না। বললে—হৃদয়দা আছেন ?

উত্তর এল, আছেন—তার অসুখ। কে আপনি, ভিতরে আসুন না।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সে ঘরে ঢুকল। কথাবার্তার সুর স্বর ভঙ্গি এখানকার সঙ্গে এমনি বেমানান যে, সে বিস্মিত না হয়ে পারলে না কোথাকার মেয়ে।

সে ঘরে ঢুকে বললে—আমি বীরেনের মামা।

একটি কালো রোগা লম্বা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। অবাক খুব হল না, সে এমনিই প্রত্যাশা করেছিল। কোন অঙ্গে গঠননৈপুণ্যের কোন চিহ্ন নেই, অথচ একটি শ্রী আছে। বয়স অনেকটা। বুড়ি তো হবেই। মেয়েটি সবিস্ময়ে বললে—নারানদা।

নারান বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা করলে তাকে।—কে ? কে ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজেও তার স্মৃতিকে আবিষ্কার করতে পারলে না সে। কিন্তু মনে হল—এ চেনা, একে তো চেনে।

সে নিজেই চেনা দিল। দাওয়া থেকে নেমে এসে তাকে প্রণাম ক'রে বললে, আমি নিরু।

নিরু! একটা বজ্রপাত হয়ে গেল। নিরু এখানে! এই শীর্ণ শরীর, সেই কালো মাজা রংয়ের মার্জনার উপর অমাজা কাঁসার বাসনের মত একটা ছোপ পড়েছে। এই জীর্ণ কাপড় পরনে, দু-হাতে দু-গাছা শাঁখা। সিঁথিতে সিঁদুর। নারান হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নিরু বললে, লক্ষ্মীদি মারা গেছেন। তাঁর শূন্য স্থান আমি পূর্ণ করেছি। সে দিন কলেশ্বরে উনিই বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন দালালির লোভে। আমি রাগ করে কেলেঙ্কারি ক'রে চলে এসেছিলাম। এখান থেকেই চলে গিয়েছিলাম তেজ দেখিয়ে। মানুষের কপাল! সেদিন কি জানতাম যে, ওঁর হাঁড়িতেই চাল দিয়েছিলাম আমি! হাসলে সে।

প্রহেলিকা মনে হচ্ছিল সব। মাথার ভিতর, বুকের ভিতর কি যেন হচ্ছিল। সে কি বলবে বুঝতে পারছিল না। হে ভগবান! বীরেন কই—কথাটাও মনে এল না তার।

হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজ এল, খোনা আওয়াজ—নি-রু! ওঁ কে?

নিরু বললে—উনি! আমার কপাল দেখ—উনিও যাবার জন্যে সেজেছেন।

—নি—রু!

নিরু ঘরে গেল, দোরে দাঁড়িয়ে বললে—নারানদা, লক্ষ্মীদির ভাই।

—না-রা-ন! একটা আর্ত চীৎকার ভেসে এল। আঁ-য় ভা-ই! আঁ-য়। নিরু বললে—ডাকছেন তোমাকে। নারান বললে, না। নিরু হেসে বললে, না নয়, এস।

নারনের বুক ধড়ফড় করে কাঁপছিল। ঘামে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ। তবু সে পায়ে পায়ে এসে দোরে দাঁড়াল। দেখলে কঙ্কালসার হৃদয় পড়ে আছে ছেঁড়া ময়লা বিছনার উপর। দুর্গন্ধে বমি আসে মানুষের। হৃদয় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—ক্ষমা—ক্ষমা—আমি আর বাঁচব না।

নারান বিছানার পাশে গিয়ে বসল। দুই হাত তার জড়িয়ে ধরে হৃদয় কাঁদতে লাগল—ওরে আমি মহাপাপী। মহাপাপী। কি করলাম—ছি-ছি-ছি! সব্বস্বান্ত হয়েছি—আর ওই মেয়েটার—

নারান বললে—শান্ত হও হৃদয়দা। শান্ত হও—। কি করবে? মানুষ যা করে তার উপর কি তার হাত থাকে? আমি যে মারপিট করে জেল খেটে এলাম।

—কবে খালাস পেলি? ওঃ, তুই এঁকটা বীঁর রে! গায়ে হাত দিল সে সস্নেহে।

—আজই। সোজা আসছি জেল-ফটক থেকে। নারান বললে একটু হেসে।

হঠাৎ বালক-কণ্ঠের মা-মা-ডাক শুনে নারান চমকে উঠল।—বীরেন!

হৃদয় বললে—হ্যাঁ। ওঁই, ওঁই একমাত্র সান্ত্বনা রেঁ। মা-হারা ছেলেটা সঁত্যি মা পেয়েছে। নারান বেরিয়ে এসে দেখলে—সত্যিই—নিরুর কোল ঘেঁষে বীরেন—ঠিক মায়ের কোল ঘেঁষে বসার মত বসে দোরের দিকে তাকিয়ে আছে তাকে দেখবার জন্য। সুন্দর ছেলে, সুন্দর বীরেন! রোগা হাড়-জিরজিরে, কিন্তু মুখখানি টস টস করছে। অবিকল দিদির মুখ।

* * *

গোসাঁই বললে—ভাগ্য? তাই সত্যি। অর্থনৈতিক অবস্থা? তাই সত্যি। মহাকালের কুরুক্ষেত্রে একটি নারী-বলি? তাই সত্যি। যা অজুহাত দেওয়া যাবে তাই সত্যি।

নিরু রাগ করে চলে গিয়েছিল—খুড়ীমা নারানের মাসীর সঙ্গে। সে পড়ছে—পড়বে, তারপর ভাল ঘরে বিয়ে হবে, সুন্দর বর, সুন্দর ঘর—নগরে মহানগরে তাদের বাড়ী। তখনই তারা ভাড়ায় খোলার চালের বাড়ীতে থাকত—দমদমে। কেরোসিনের আলো জ্বালত। কিন্তু ইলেকট্রিক লাইট ফ্যান—এর সাধ ছিল বৈকি। বিয়ে না হয়—পড়বে, পাশ করবে—ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ। ইস্কুলে মাস্টারী করবে। কিন্তু বিয়েও হয় নি—পাশও করতে পারে নি। ষোল বছর পার করেও যখন ক্লাস নাইন পৌঁছুতে পারল না, তখন পড়া ছাড়লে। খুড়ীমা হাঁপানির রোগী, সম্বল কিছু তখনো ছিল, কিন্তু তার মধ্যে বিয়ে দিতে পারলেন না। বরেরা কালো মেয়ে পছন্দ করে না, পছন্দ করলে টাকা চায়, সে টাকা নেই। দুটো একটা বাউণ্ডুলে মেলে, যারা বিয়ে করতে চায়—তাদের নিরু পছন্দ করে না। বলে—বিষ খাব। নয় তো চলে যাব ঘর থেকে। তখন চল্লিশ সাল এসে গেছে। একচল্লিশে নিরুর অপবাদ রটল পাড়ায়। খুড়ীমা বলেছিলেন—তুই মর—তুই মর—তুই মর!

নিরু মালিশ খেয়েছিল মরবার জন্যে। কিন্তু খেয়েই ছুটে এসেছিল খুড়ীমার কাছে—মা গো, আমি বিষ খেয়েছি! নিরুর ভাগ্য! ভাগ্যই ভয় দেখিয়ে তাকে করিয়েছিল। নইলে এমনটা করবে কেন? স্থানীয় ডাক্তারের দয়ায় বেঁচেছিল, সামান্য পুলিশ হাঙ্গামা হয়েছিল। তাও সামান্য ঘুষেই মিটেছিল। এর পর খুড়ীমাও কিছু বলেন নি, নিরুরও বিয়ে

হয় নি। কলকাতায় বিশ-চব্বিশ-তিরিশ বছরের অবিবাহিতা মেয়ের তো অভাব ছিল না। নিরু পাড়ায় দুটো তিনটে বাচ্চা ছেলেকে পড়াতো। পনেরো টাকা পেত। তাও সব মাসে পেত না। তাগাদা করলে জবাব দিত। কিম্বা তিন মাস বাকী রেখে তারপর থেকে এক মাসের করে পেত। সেটা কম ছিল না তখন—তখনও বিয়াল্লিশ আসেনি। না আসুক—নিরুর সতেরো পার হচ্ছে। পাড়ার বখা ছেলেরা ঠাট্টা করত, ইশারা করত। নিরু তা সহ্য করে মুখ বুজে চলে এসে উপেক্ষা করবার কৌশল নিজেই আবিষ্কার করেছিল। তবে পাড়ার লোকে, প্রবীণেরা এবং আরও দু-চারজন তাকে স্নেহ সহানুভূতির চক্ষে দেখতেন। যে মেয়ের রূপের অভাবে, অর্থের অভাবে বিয়ে হয় না—মিথ্যা কলঙ্কের জন্য যে দুঃখে বিষ খেতে যায়—সে স্বাভাবিক ভাবেই স্নেহ পায়; সেও পেয়েছিল।

তারপর এল কাল—বিয়াল্লিশ। মহাকালের আগুন ছড়ানো বাতাস মাথায় করে সর্বনাশা বৎসর। বন্যা—সাইক্লোনে কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় মানুষ মরে নি—তাদেরও মরণ হয় নি। কিন্তু তখন চালের দর ডালের দর চড়ছে। কাপড়ের দরে আগুন লোগছে। খুড়ীমার সম্বল শেষ হয়ে শ-দুই-তিনে ঠেকেছে। গহনা সবই তার আগে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে—যা হয় হবে বলেই তবুও পড়েছিল। তখন কলকাতায় লোক কমেছে। রেঙ্গুনের পতন হতেই লোক পালিয়েছে। যাদের বাড়ীতে নিরু ছেলে পড়াতো—তাদের একজনরা চলে গেছে। দু বাড়ীর দশ টাকা আছে। তারাও বলতে শুরু করেছে—আর পারব না। আয়ে কুলুচ্ছে না।

এমন সময় বিশে ডিসেম্বর বোমা পড়ল। সকাল থেকে কলকাতায় আতঙ্ক ছড়িয়ে গেল। একুশে বাদ দিয়ে বাইশে। হাতীবাগানে বোমা পড়ল। নিরুর খুড়ীমা আঁ-আ-শব্দ করে আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। নিরু থর থর করে কাঁপছিল—সে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ—তারপর ছুটে এসে কাছে বসে চীৎকার করে ডাকলে—মা-গো-মা! মা! না, খুড়ীমা মরে নি। মরলে তার এ ব্যবস্থা করত কে? চব্বিশে বোমা পড়ল আবার। কলকাতার লোক পালাল ভয়ার্ত ভেড়া-ছাগলের পালের মত। যে যেখানে পারে, যার চলবার শক্তি আছে—সেই পালাল। যার সামান্য অর্থ আছে সেই পালাল। যার কোথাও কোন আত্মীয় আছে, সেই পালাল। তাদের খুড়ীমার চলবার শক্তি ছিল না—অর্থও ছিল না—আপনার জনই বা কোথায়? নিরুর দিদিরা এরা পালিয়েছে। ভাই কোথায় তা জানত না। তারা কোথায় যাবে? নারানের কথা মনে হয়েছিল—কিন্তু সে তো দিদির বাড়ী পোষ্য—কোথায় যাবে সেখানে? খুড়ীমার বাপের বাড়ীর ঘরদোর পড়ে গেছে শুনেছিল। সেখানেই বা কোথায় যাবে। অন্ধকার। না—সব শূন্য। মাথার উপরে আকাশ। সেখানে উড়ছে বম্বার প্লেন। খুড়ীমা হাঁপাতেন আর বলতেন—মরে যাব। নিরু—মরে যাব।

এরই মধ্যে একদিন নিরুর হাত ধরে কে টেনেছিল। চীৎকার করে উঠেছিল সে। ভাগ্যক্রমে লোক এসে পড়ায় বেঁচেছিল। সন্ধ্যে থেকে ব্ল্যাক আউটের রাত্রি ঠুঙ্গি পরা

আলো যেন হিংস্র কামার্ত দাঁত মেলে হাসে। ঘরে সন্ধ্যেবেলা থেকে খিল দিয়ে বসে থাকত তারা।

হঠাৎ একদিন হৃদয়ের চিঠি এল। "লক্ষ্মী তাহাকে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে।" যেমন নারানকে চিঠি লিখেছিল হৃদয়—তেমনি লিখেছিল মাসীকে।

ক'দিন পর মাসী বলেছিলেন—চল নিরু, হৃদয়ের ওখানে যাই।

—সে-খা-নে! কে-ন? ভয় সেই মুহূর্তে পেয়েছিল নিরু। মাসী বলেছিলেন—ওরে এখানে, বুঝতে পারছিস তো আমার দিন নেই, মরব। তখন—

—মা! খুড়ীমা! আরও আতঙ্কিত হয়েছিল নিরু। সেই মুহূর্তটি কল্পনা করে তার আতঙ্কের আর সীমা ছিল না। খুড়ীমা থামেন নি, বলেছিলেন—আমি মলে তুই কি করবি? তোকে যে টেনে ধরে নিয়ে যাবে! খাবি কি করে? ভাড়ার বাড়ী। আমার হাতে এখন একশো টাকাও নেই। ক'দিন চলবে? বাড়ীওলা বের করে দেবে। একটা আশ্রয় তো চাই তোর। সেখানে নারান আছে—লক্ষ্মী মরেছে—হৃদয় আছে। আর কিছু বলেন নি, বলতে পারেন নি, খুড়ীমা হাপরের মত হাঁপিয়ে ছিলেন।

নিরু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল—তাই চল খুড়ীমা। পরদিন তারা এখানে রওনা হয়েছিল। মহাকালের বলি দিতে এসেছিল। নিরুর তবু আশা ছিল—যদি নারান থাকে! নারানদা! মনে মনে তাকে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছিল।

নিরু গভীর রাত্রে নারানকে বলছিল সব। হৃদয় কাতরাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, জাগছে, কাতরাচ্ছে। নিরু ভিতরে যাচ্ছে—তার মুখে জল দিচ্ছে, বাতাস দিচ্ছে; সে ঘুমিয়ে পড়ছে—নিরু বাইরে আসছে। নারান চুপ করে দাওয়ায় বসে আছে। শুনেই যাচ্ছে। নিরু বললে—এমন কল্পনা তোমাকে করিনি। করতে পারি নি। তুমি আশ্চর্য হয়েছো নারানদা! প্রথমে—। হেসে বললে—আমরা এলাম আমাদের দেখে প্রথমটা অবাক হল—তারপর হাউ হাউ করে কাঁদলে লক্ষ্মীদির জন্যে।

—লোকটি খুব আঘাত খেয়েছিল। সত্যিই খেয়েছিল। বদলেছেও। সত্যিই বদলেছে। ওর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে বলছি না! হাসলে নিরু।

নারান নির্বাক। শুনেই যাচ্ছে। নিরু বললে—মানুষ তো! লক্ষ্মীদিকে যত লাঞ্ছনা করুক, ভালবাসত। হয়তো নিজেও জানত না। তা ছাড়া তখন ও সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছে। যুদ্ধের বাজারে বড়লোক হবার জন্যে সর্বস্ব বিক্রী করে মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট নিতে গিয়েছিল। চোরা-কারবার করতে গিয়েছিল। কিন্তু সবাই তো বড়লোক হয় না, ফকীরও হয়—ও ফকীর হয়েছিল। কিন্তু স্বভাব যেটা, অভ্যাস যেটা সেটা বদলের মধ্যেও বোধহয় মরে না। নইলে…।

হেসে বললে—খুড়ীমা এসেই সোজাসুজি বলেছিল—বাবা, আমি তো মরব। হয় এক মাস। নয় দু মাস। তার বেশী নয়। আমি এসেছি মেয়েটার জন্যে, বাবা। ও তো ভেসে যাবে। নয় তো চরম দুর্গতি হবে—মেয়ে-জীবনের সর্বনাশ হবে। তাই খবর পেয়ে এসেছি। তোমার ঘর খালি—ওই ছোট ছেলে। হয় তোমার হাতে, নয় নারানের হাতে—

তা নারান তো বলছ জেলে! ও বলেছিল—সে বড় সাংঘাতিক লোক হয়েছে মাসীমা, ভীষণ লোক। ভয়ঙ্কর। বুঝেছেন? খুড়ীমা চুপ করে থেকে বলেছিল—সে তো জেল থেকেই প্রমাণ, বাবা! তা তুমিই দয়া করে মেয়েটাকে নাও।

দয়া করে নয়, খুব আগ্রহ করেই নিয়েছিল আমাকে। আমি আপত্তি করি নি। আমার আপত্তির কি ছিল? তেজ? শক্তি? আশা? কার আশা করব? এক তোমার।

চুপ করে গিয়েছিল নিরু। নারান বলেছিল—থাক নিরু। নিরু বলেছিল—লজ্জা তুমি কেন পাচ্ছ নারানদা? দেখ, প্রেম তোমার সঙ্গে আমার তো সেই দু-তিন-দিনের। সত্যি বলতে ভাল লেগেছিল। এমন করে কোন ছেলের সঙ্গে তার আগেও বটে পরেও বটে, মিশিনি। কেউ এমন করে ফুল তুলে দেয় নি। কারুর এত সাহসও দেখি নি। তাকে ঠিক প্রেম বলে না। আর তুমি লেখা-পড়া জানতে না বলে—একটা অবজ্ঞাও ছিল। তবু ওর তুলনায় সেদিন তোমাকেই কামনা করেছিলাম। কিন্তু ও মিথ্যে করে বলেছিল, তুমি গুণ্ডা। আজ দেখে মনে হচ্ছে আমি ঠকেছি। ঠকিয়েছে ও-ই। সে কথাও ওর সঙ্গে হয়েছে আমার।

বিয়ে হয়ে গেল দশ দিনের মধ্যে। খুড়ীমার অসুখ বেড়ে উঠল। তিনিই ধরলেন। হয়ে গেল বিয়ে। আশ্চর্য! কটু কথা বলে নি আমাকে। সে পুরনো কথা তোলে নি। শুধু হেসে বলেছিল—মজা দেখ, সেদিন কি রাগটাই করেছিলাম। তা, তখন কি জানি যে, আমার হাঁড়িতেই চাল দিয়ে তুমি বসে আছ? আমি বলেছিলাম—চাল কি চুলো দুটোর যে কিছুই নেই আমার। ভাতের চাল তো দূরের কথা। থাকলে সে আমি দিতাম না। বিধাতা দিতে গেলেও হাত চেপে ধরতাম। দুটো ভাত—আর এই ভাঙ্গা চাল-এর দাম এত, তা জানতাম না। ও চুপ করে ছিল কিছুক্ষণ। আমার বলে ভয় হয়েছিল। কিন্তু ও বলেছিল—আমার অন্যায় হয়ে গেল, নয়? হুঁ, লক্ষ্মীকে বলেছিলাম। তাছাড়া—। হঠাৎ বলেছিল—নারানের সঙ্গে। তা মানাতো তোকে। ছোঁড়া উপযুক্ত হয়েছে। তা? কি করব!

একটা ভয় ছিল ওর। লক্ষ্মীদির প্রেতাত্মার ভয়। এটা তাই কি কি জানিনে। হয়তো দুটোই। ওর অসুখ তা থেকেই। খুড়ীমা মারা গেল মাস দেড়েক পর। শ্মশানে গেল—ফিরে এল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে। বললে—শ্মশানে না কি লক্ষ্মীদি ওকে ডেকেছে। মদ অবিশ্যি খেয়েছিল। শরীর ভাল ওরও ছিল না। এদেশের সর্বনেশে জ্বর তখন হচ্ছে। ওকেও ধরেছে। সেদিন আমাকে বললে—আঁকড়ে ধরে থাক। থর থর ক'রে কাঁপছিল ভয়ে। বলেছিল—নারানের সঙ্গে বিয়েটা দিলেই ভাল হত। তুমিও সুখীও হতে। শুধু ছেলেটার জন্যে, বুঝেছে—। ঠিক এর এক মাস পরে জ্বরের মধ্যে লক্ষ্মী-লক্ষ্মী বলে ভয় পেয়ে মূর্ছা গেল। শুয়েছে তারপর থেকে।

তা—নিরু বলেছিল—তা, বীরেনকে পেয়ে আমার দুঃখ আমি ভুলেছি নারানদা। বড় ভাল ছেলে। বড় মায়াবী। বড় স্নেহকাঙাল। ঠিক তোমার মত। আমার বুক ও ভরে

দিয়েছে। সব দুঃখ আমি ভুলে যাই। ওকে একবার দেখে আসি আমি, দাঁড়াও।

নিরু উঠে গিয়েছিল বীরেনকে দেখতে। স্বামীকে দেখতেও বটে।

নারানের সারা অন্তরটা নিরুর প্রতি স্নেহে—হেসে গোসাঁই বলেছিল—প্রেমে যদি বলেন, প্রেমেই—যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, তেমনি হৃদয়ের উপর আক্রোশে ঘৃণায় ভরে উঠেছিল। সে ঘৃণা, সে আক্রোশে তাকে অধীর করে তুলেছিল। নারান বলে—তার স্পষ্ট মনে আছে সে রাত্রির কথা—সে অধীর হয়ে উঠে চলে এসেছিল নদীর ধারে। ভয় তো নারানের ছিল না। নদীর ধার বালুচর শরতের জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছিল। দেড় বছর জেলে বন্ধ ছিল। সেদিন এমনি সুন্দর রাত্রিতে এত সুন্দর বালুচরে দাঁড়িয়েও তার মন শান্ত হয় নি—সে আত্মসম্বরণ করতে পারে নি। বেশ চীৎকার করেই বলেছিল—তুমি মর, তুমি মর, তুমি মর।

—নারানদা! পিছন থেকে মিষ্ট কণ্ঠে ডেকেছিল নিরু। সে চমকে উঠেছিল। ফিরে তাকাতেই নিরু বলেছিল—উঠে চলে এলে? এস, বাড়ী এস। কেন মিথ্যে ওকে অভিসম্পাত দিচ্ছ। নিজের সুখ, তার জন্যেই তো মানুষ দুনিয়ায় আসে। ও দুর্ভাগা মানুষ। জান—লক্ষ্মীদির ভয়ে আমাকে ও ছুঁতে পারে না। মরতেও আর বেশী দেরি নেই। ডাক্তার একজন আসে। সে বলছে—হার্ট জখম হয়ে গেছে।

* * *

পালা যত শেষ হয়—চাল তত দ্রুত হয়। মহাকালের তাণ্ডবেও তাই। তেতাল্লিশে সে মাঝখান। ঝম্ ঝম্ ক'রে বাজছে পায়ের ঘুঙুর। করতালে ঝনো-ঝনো-ঝনো শব্দ বাজছে। তার মধ্যে মানুষের হৃৎপিণ্ডের তাল রেখে চলা সোজা নয়। দিন চারেক পরই হৃদয় মারা গেল। মারা গেল বসে বসে। সকাল বেলা পিঠে বালিশ দিয়ে উঠে বসত। একটু কড়া মেজাজ হ'ত। রাত্রের ভয়টা কাটতো তো। তা ছাড়া বিশ্রামের জন্য সুস্থও একটু থাকত। চায়ের জন্য, খাবারের জন্য চেঁচাত। নারান চলে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু হৃদয়ই দেয় নি। বলেছিল—ওরে, দু দিন থাক। তুই য' দিন এসেছিস—লক্ষ্মীর আঁচলের খসখসানি আর পাই নি। তা ছাড়া তোর কাছে অনেক অপরাধ আমার। মরতে বসেছি রে! বুঝতে পারছি আমি আর বাঁচব না। না! থাক দু দিন। তা ছাড়া ভাই—

তার হাত ধরে বলেছিল—আমি মরে গেলে ওদের ভার যে তোকেই নিতে হবে ভাই।

—হৃদয়দা—

—চুপ কর নারান। শোন। আমার বিষয় সম্পত্তি ক'বিঘে জমি ছিল তা বেচেছি। ব্যবসা করতে গিয়েছিলাম। ওরা কি খাবে? তা ছাড়া ছেলেটাকে পড়াতে হবে। আর ওই মেয়েটা! মাসী ওকে তোর হাতে দেবার জন্যেই এনেছিল। তুই জেলে তখন। তার উপর আমার দুর্মতি লোভ, আর ওর ভাগ্যি। তাই বা কি ক'রে বলি। লক্ষ্মী বলেছিল—গা ছুঁয়ে বল আমায়, তুমি বিয়ে করবে না। আমি বলেছিলাম—করব না, করব না, করব না। সে বলেছিল—আমি তা সইতে পারব না। মরেও পারব না। তা হলে ফিরব আমি

তোমাকে নেবার জন্যে।

—ও তোমার মনের ভ্রম হৃদয়দা। ও ভ্রম। নারান বলেছিল।

—না রে। ঘাড় নেড়েছিল হৃদয়। তারপর বলেছিল—যাক গে সে কথা। সে আমার কথা। তোর নয়। তুই না মানিস, আমি মানি। এখন—ওই মেয়েটা। বীরেন তোর ভাগ্নে, তুই ছেলেবেলায় ভালবাসতিস—তুই মানুষ ভাল, ওকে ফেলবি না—তা জানি। কিন্তু ওই মেয়েটা? ওরে, এর মধ্যেই নদীর ওপারের গুণ্ডারা ওর দিকে তাক ক'রে রয়েছে। রাজ্য তো দেখছিস, অরাজক। ওরাই রাজা। ওকে যে তোকেই রক্ষে করতে হবে ভাই। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—আমি অন্যায় করে বিয়ে করেছি রে। ও তোকেই কামনা ক'রে এসেছিল।

তিন দিন ধরেই এই সব কথা হচ্ছিল। সেদিন সকালে বসে বললে—জানিস, একটু ভাল মনে হচ্ছে রে। কাল রাতে লক্ষ্মীকে দেখেছি। মুখখানা রাগ রাগ নয়, হাসি হাসি।

হঠাৎ বলেছিল—শোন। হ্যাঁরে—আজকাল তো বিধবা বিয়ে করছে লোকে—

নারান বলেছিল—ছিঃ হৃদয়দা।

হৃদয় বলেছিল—ওরে, এ চারদিন ওর যে আনন্দ দেখছি রে।

নারান দৃঢ়স্বরে বলেছিল—আজই তা হ'লে চলে যাব আমি।

—কিন্তু আমার মৃত্যু-সংবাদ পেলে আসিস। নইলে মেয়েটাকে বেজাতে লুঠে নিয়ে যাবে।

নারান বিরক্ত হয়ে উঠে চলে গিয়েছিল। গিয়ে বসেছিল নদীর ধারে। কিছুক্ষণ পর ভল্লাদের একজন ছুটে এসে বলেছিল—শিগ্‌গির আসেন। হৃদয় ঠাকুর গেলেন।

—সেকি! চমকে উঠেছিল নারান।

—হ্যাঁ। বসেছিলেন ঠেসান দিয়ে। ওষুধ এনে বউ ডাকলে—খাও। রা' নাই। নেড়ে দেখে মরে গিয়েছে। তেতাল্লিশের মড়কে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পড়ে মরেছে, বসে মরেছে, গাছে চড়ে চালে চড়ে হঠাৎ মারা গিয়ে নীচে পড়েছে ফলের মত।

একটু জল খেলে গোসাঁই। তারপর বললে—মমতা মধুও বটে, মদও বটে। মমতা সোনার সুতো, কিন্তু লোহার শেকলের চেয়ে শক্ত আর জীবন্ত সাপের মত পাকে পাকে কষে বাঁধে। ছিঁড়তে যারা পারে, তারা হয় দেবতা—মহাবীর, নয় তো, জানোয়ার। সাধারণ মানুষের ওই পাকের মধ্যে যত কষ্ট, তত আনন্দ। হৃদয়ের শ্রাদ্ধের শেষে নারান ওই বাঁধন পরেই ফিরল। দশ দিনে শ্রাদ্ধ গেল। দশ দিনের মধ্যে অন্তত বিশবার ওপারের গুণ্ডারা ছুতো-নাতায় এপারে এসে পাক দিয়ে গেল। তখন লীগের রাজত্ব। জাত হিন্দু তখন বড় অসহায়। ইংরেজ হাড়ে হাড়ে চটা। দেশের নেতারা জেলে। গুণ্ডারা তখন অবাধে অত্যাচার করে অসহায় দুর্বল হিন্দু যারা, তাদের ওপর। হৃদয়ের গ্রামটি ছোট গ্রাম—ঘর পনেরো ব্রাহ্মণের বাস—সবাই দরিদ্র, দুর্বল, ভীরু। গ্রামের বল ছিল ভল্লারা। রাম ভল্লা নেই। যারা আছে—তারা কঙ্কালসার। ওপারের গ্রামখানা প্রকাণ্ড। কতকগুলো দুর্দান্ত

লোকের বাস। তাদের পৃষ্ঠপোষক আছে কয়েক ঘর সম্পত্তিশালী লোক। নিরু সংকল্প করেই রেখেছিল—সে যাবেই, নারান পড়েছিল সোনার সুতোর বাঁধনে। বীরেন তার ভাগ্নে। তার প্রতি মমতা তার সেই বাল্যের। আর নারান মিথ্যে বলে না। সত্য বলে সে। সে নিরুকে ভালই বেসেছিল। তবে জানোয়ার সে নয়। না নয়। সংসারে নারীর প্রেম মানেই যারা বলে দেহ-কামনা—তারা কামুক—বিকৃত মন—ব্যাধিগ্রস্ত মন—সে তাদের দলের নয়। নিরুর সঙ্গে সে খোলা কথাই কয়েছিল। বলেছিল—নিরু, আমি তোমার অপমান করব না। তবু মানুষের মন—যদি চঞ্চল হয়, বলব তোমাকে; তুমি রাগ না ক'রে চলে যেয়ো।

নিরু তার হাতে একটা টিনের বাক্স দিয়ে বলেছিল—এটা রাখ। এইটে তার বিছানার তলায় মেঝেতে ছিল। আমাকে বলেছিল আগে। কিছু থাকবে, মরলে তুলে নিয়ো। ওতে সাতশো টাকা আছে আর গয়না আছে কয়েকখানা, বোধহয় লক্ষ্মীদিদির। ওটা—যে দিনের কথা বলছ, সেদিন খরচ শেষে যা থাকবে, তাই দিয়ে ফেরত দিয়ো। দেখ, সে আমাকে বলে গেছে বিধবা বিয়ে উঠেছে, লোকে করছে, তুমিও করো। কিন্তু বীরেনকে ছেড়ে তার মনে ধাক্কা দিয়ে তা তো পারব না আমি। চল।

ভল্লাদের গাড়ী নিয়ে রওনা হয়েছিল। কিছুদূর এসে নারানের মনে হয়েছিল তার নিজের গ্রামের কথা। ঘাটবলরামপুরের কথা। সে কথা দুঃস্বপ্নের মত, দুশ্চিন্তা। চঞ্চল হয়ে উঠবে গ্রাম। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল সে নিরুকে। রুখু চুল; ছোপধরা কাঁসার বাসনের মত হলেও কালো মেয়েটির মুখে ছোপের তলা থেকে একটি মার্জনার আভাস। দীর্ঘাঙ্গী। হাতের শাঁখা ভেঙ্গে দু'গাছি ক'রে সোনার পাতমোড়া ব্রোঞ্জের চুড়ি পরেছে। একটি উদাসীন নিশ্চিন্ততার নির্লিপ্ত প্রশান্ত। একটা স্বস্তিতে সে অক্ষুব্ধ, একটু বিষণ্ণ। বীরেন মাথা কামিয়েছে। সে কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। নিরু তার দৃষ্টি দেখে একটু হেসে বললে, কি?

হেসে নারান বলেছিল—তোমাকেই দেখছি।

বিচিত্র হেসে মাথায় ঘোমটা টেনে নিরু বলেছিল—আমাকে কি দেখে? দেখতে নেই।

নারান বলেছিল—দেখছি আর ভাবছি আমি দেখব না, কিন্তু সেখানকার লোক? তারা কি বলবে?

—বলুক, যা বলবে বলুক।

—কিন্তু তারাও তো দেখবে!

নিরু স্থির প্রসারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—সেখানেও দেখবে?

—এ তো সর্বত্র নিরু। তাই ভাবছি।

নিরু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল—তুমি রক্ষা করতে পারবে না? আমি কি করি বলতে পার?

—সে ভাবনা আমিই ভাবছি, তুমি ভেবো না।

আমি নিশ্চিন্তি। বলে সে টাপরের গায়ে ঠেস দিয়ে চোখ মুদেছিল। নারান দুঃস্বপ্নের মত দুশ্চিন্তাগুলোকে বার বার মনে মনে বিদ্রোহ করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। কার্তিকের প্রথম। এবার মাঠে ফসল অপর্যাপ্ত। ধানের এবার আর শেষ নেই, পরিমাপ নেই। আশ্চর্য। প্রকৃতিরই হোক আর সেই বিধাতারই হোক, কি ভাঙ্গা-গড়া? গত বৎসর এত বড় প্রলয়ের পর—দুর্ভিক্ষ-মড়কে যখন দেশ শ্মশান হয়ে উঠেছে, তখন এ কি খেলা। একটি সুন্দর সুবর্ষা। মাঠ জুড়ে ধান, ধান আর ধান। কিন্তু সব জমি চাষ হয় নি। কঙ্কালেরা বুক দিয়ে চাষ ঠেলতে পারে নি। তা না পারলেও এবার অনেক ধান—অনেক ধান। বিচিত্র মানুষের মন। কিম্বা হয়তো মানুষের মন সুখের সামান্য আভাসেই, প্রত্যাশাতেই সব দুশ্চিন্তা দুঃস্বপ্ন ভুলে যায়। রাত্রির অন্ধকারে জেলখানাটা বুকে চেপে বসত। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে বাইরের গাঢ় অন্ধকার আর কালো গাছপালার মাথাগুলো তার দুঃস্বপ্নকে বাস্তব বলে ভ্রমে ফেলত। কিন্তু সকালের আলোর আব্‌ছা উন্মেষেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত। স্বপ্ন মনে থাকত না। এবারে মাঠভরা অপর্যাপ্ত ফসল তার দুশ্চিন্তা, তার বিদ্রোহ কল্পনাকে ঢেকে দিল একটি রোদ-পড়া সবুজ পর্দা দিয়ে। ঝলমল করতে লাগল। সেই পর্দা পিছনে রেখে নতুন কল্পনা গড়ে উঠতে লাগল তার মনে। গাড়ীর ঝাঁকানিতেও ভাঙল না। পথের মানুষ দেখে বিক্ষিপ্ত হল না। দূরে দিগন্তেও হারিয়ে গেল না। এরই মধ্যে সেও ঘুমিয়ে পড়েছিল। গাড়ীতে বসে বসেই ঘুমুচ্ছিল; ভাঙছিল, জুড়ছিল; চোখ মেলছিল, আবার বুজে আসছিল আপনি। দুপুর গড়াচ্ছে, ঘুমের সময় এটা।

হঠাৎ বন্দুকের শব্দে ঘুম ভাঙল। সামনে চেয়ে দেখলে···তাদের গ্রামের ধারের বিল। হাঁস আসতে শুরু হয়েছে। মানুষেরও ব্যাধবৃত্তি জেগেছে।

হাঁসগুলো উড়ছে। বন্দুকের পাল্লার বাইরে পালাচ্ছে। সামনের শরবনের মাথায় ধোঁয়া উঠছে বন্দুকের নল থেকে। এরই আড়াল থেকে লুকিয়ে মেরেছে। সেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছাটা একবার বিদ্যুৎচমকের মত চমকে উঠল। পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করলে সে। বেলা অনেক হয়েছে। গাড়ীতে বীরেন-নিরু। দেরি হবে। ওদের দিকে সে তাকালে। তারাও জেগে উঠে ঘাড় উঁচু করে বিল দেখছে। বীরেন বলে উঠল—ওঃ, কত পাখী! ওরে বাবাঃ। দেখ মা, দেখ, ওই-ওই-ওই।

নারান বললে—আমাদের গাঁয়ের বিল। হাজার হাজার হাঁস আসে।

বীরেন সোৎসাহে বললে—পোষা যায় না? নারান হাসলে—না। বুনো হাঁস এরা।

নিরু বললে—আহা, বড় সুন্দর বিল। স্নান করতে ইচ্ছে করছে। জান, আত্মহত্যা করলে এখানে বিলে ডুবে মরাই ভাল।

—কেন? ও কথা কেন? বীরেন রইল। মানুষ করতে হবে। আমাদের স্নেহের সম্পর্কে ভরা একখানি সংসার গড়তে হবে। আমি সুখের উপকরণ আনব। তুমি শান্তির ঘট ভরবে। বীরেন আশা আমাদের—

—কোথাকার গাড়ী ? গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মালিকানার আমেজ সে স্বরের সর্বাঙ্গে। চমকে উঠল নারান—নিরুর মুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালে। সে চিনেছে। হ্যাঁ সেই। বড় ঘাসবনটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ভূতনাথবাবু। সঙ্গে একজন পাইক। আর দুজন লোক। চাষী শ্রেণীর। সে অবাক হয়ে গেল। না, তার থেকেও বেশী। স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কথা বললে না। মনে হল ভূতনাথবাবু কিছু বলতে চাচ্ছে—কিন্তু নারান দাঁতে দাঁতের পাটি চেপে বসে রইল। দৃষ্টিটা সামনে প্রসারিত করে দিলে। তার মনে অকস্মাৎ এক মুহূর্তে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। তার ক্ষোভ। তার আক্রোশ। কিন্তু একি ? এও সম্ভব ? সেই ভূতনাথবাবু ? মার্জনার ছাপ সর্বাঙ্গে, একটি অভিজাত লাবণ্য সর্বাঙ্গে। সেই এই ? একটা বীভৎস-ভয়ঙ্কর স্থূলকায় মানুষ। চোখ লাল। তাতে কি উদ্ধত উগ্র রুষ্ট দৃষ্টি। গায়ে মাত্র এক গেঞ্জি, এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতে দুটো মরা হাঁস। ঠোঁটের দুপাশে পানের রস উপ্‌চে পড়ছে। সঙ্গের পাইকটার হাতে বোতল। পাইকটা ধমকে উঠল—এই গাড়োয়ান। শুনতে পাস না ? কোথাকার গাড়ী ?

ভূতনাথ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতেই বললে—যাক। নিরু প্রশ্ন করলে—ও কে নারানদা ?

—ও ? ও সেই। ভূতনাথবাবু। যার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে জেল গিয়েছিলাম। নিরু শিউরে উঠল—মা গো ! কি ভয়ঙ্কর লোক।

—ভয় করছে ? হেসেই জিজ্ঞাসা করেছিল নারান। বদলে গেল নিরু—না, ভয় করবে কেন ? তুমি রয়েছ, আমি কেন ভয় করব ?

গাড়ীটা গ্রামের মধ্যে ঢুকল ; সম্মুখেই বাউড়ীপাড়া—পাড়াটার পাশ দিয়ে রাস্তাটা গ্রামে গিয়ে ঢুকেছে। বাউড়ীপাড়ার পরে কাঠা-কয়েক ফাঁকা জায়গার পরেই তার বাড়ী। বাড়ীটার দিকে তাকালে নারান। বাড়ীটা আছে, গোটাই আছে। তবে অনেক মার খেয়েছে। অনেক ঝাপটা খেয়েছে। সামনে যে একতলা মাটির ঘরটা নতুন করেছিল—সেটার দাওয়ার চালটা নেই। ভেঙে পড়ে দাওয়ার উপরেই কঙ্কালের মত পড়ে রয়েছে। বিপিন এসে দাঁড়াল সাড়া পেয়ে।—নারান ভাই। এলে ? নারান বললে—হ্যাঁ। নাম্ নিরু। বীরেন, নাম্।

নামল ওরা। বিপিন বললে—ভাগ্নে ? নারান বললে—হ্যাঁ। খবর জান তো ? খবর তো পাঠিয়েছিলাম। সেটা পাঠিয়েছিল সে। বিপিন বললে—হ্যাঁ। আঃ। এক বছরের মধ্যে। তা—ইনি ? নারান বললে—ওই নিরু। মাসীমার ভাসুরঝি—পালন করা মেয়ে। হৃদয়দার সঙ্গে এই আষাঢ়ে বিয়ে হয়েছিল। তারপর নারান বললে—কিন্তু এ কি হয়েছে গাঁয়ের চেহারা বিপিনদা ? বিপিন বললে—সব মরা নারান ভাই, স-ব মরা আর আধমরা। মেরে দিয়ে গিয়েছে ভগবান। যেটুকু জান ছিল—তাও থাকবে না। গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে ভূতনাথ চাটুজ্জে। নারান বললে—দেখে এলাম। দেখা হয়ে গেল গাঁ ঢুকতে। কিন্তু ও

কি চেহারা হয়েছে বিপিনদা।

—চুপ করো! বলো না। মুখের দিকে তাকাবারও সাহস হয় না কারু।

* * *

সত্যি। অক্ষরে অক্ষরে বিপিনের কথা সত্যি। ভূতনাথের মুখের দিকে তাকাতেও কেউ সাহস করে না, কথা অমান্য করবে কি? তার কোন কাজের প্রতিবাদ করবে কি? প্রথম পরিচয় সেই দিনই পেলে। সে বাড়ীটা পরিষ্কার করবার জন্য বাউড়ীদের ডাকতে গেল। তারা মাথা চুলকে বললে—আজ্ঞে মশাই! নারান জিজ্ঞাসা করলে—কি? আমি পয়সা দেব। তারা বললে—আজ্ঞে, পয়সার জন্যে নয়। দেহ তো কারুর ভাল নয়। নারান বললে—বেশ তো, দশজনে আয় পাঁচজনের জায়গায়। কানাই বললে—আজ্ঞে ঠাকুরমশাই, রায়বাড়ীতে না শুধিয়ে কি করে যাই বলেন। একটা ঝগড়া—কি বলে তো রয়েছেন আপনার সঙ্গে। নারান স্তম্ভিত হয়ে গেল। কানাই আবার বললে—উনির এখন পেবল পেতাপ। সরকার হাতধরা। তেমুনি শাসন। তার ওপর দেখেন, উনিই ধানটান দেন। গরীবদের জন্যে আজ সাত-আট মাস নোঙ্গরখানা চালাইচেন।

ফিরে এল নারান। নারান নারান, বিপিনকেও ডাকলে না। কোদাল নিয়ে সে শুরু করলে কাজ। নিরুকে বলল—তুমিও লাগ। খুশী হয়ে নিরু বীরেন দুজনেই লেগে গেল।

বিপিন বেরিয়ে এল। বললে, তোমরা বস মা। আমরা দু ভাইয়ে করছি।

নারান বললে—তুমি লাগবে বিপিনদা?

—লাগব। পিথিমীতে সবাই মরে না, ভাই। বেঁচে থাকে বই কি কতক কতক, নইলে পেলয় তো হয়েছে অনেকবার। ছিষ্টি রয়েছে কি ক'রে?

সন্ধ্যেবেলা বিপিন বললে সব কথা। রান্না ছিল না। বিপিনের মা রোগশয্যায় শুয়ে আছে, নারানের ভিক্ষে-মা সে। সে-খাবার নিমন্ত্রণ করেছিল। আয়োজন বিপিনের বউ করে দিলে—রান্না করে নিলে নিরু। বিপিন বললে সব কথা। বন্যা-সাইক্লোন-দুর্ভিক্ষ-মড়ক এক বছরে প্রলয়ের মতই এসে দেশটাকে যেন মাথায় মুষল মেরে অজ্ঞান আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেল। যাবার সময়ে যেন মুষলটা দিয়ে গেল ভূতনাথের হাতে। সেই মুষল হাতে প্রলয়ের প্রহরী হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে পাগলের মত।—তা ছাড়া কি বলব?

না, বলবার কিছু নাই। তারপর কয়েক দিন সে অঞ্চলটা ঘুরে বেড়াল। দেশ সত্যই মরার দেশ। নিষ্ঠুর আঘাতে আঘাতে প্রাণশক্তি শুধু ধুঁকছে। মানুষ যারা ছিল—তারাও মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। অজয় হাজরা কঙ্কাল হয়ে গেছে। শিবু ডাক্তার লোঙরখানা চালাচ্ছে তার গ্রামের দিকে। দু-চারটে মিটিং করে। লাল-ঝাণ্ডা তাদের। বড় বড় চাষীরা স্তব্ধ। গরীব ভদ্রলোকদের চোখে অসহায় আতঙ্কিত দৃষ্টি। ভাষা নাই। শক্তি নাই। গরীবের মেয়েরা পেটের জ্বালায় দেহ বিক্রী করছে। এরই মধ্যে মুষল হাতে মহাকালের তাণ্ডবের অনুচরের মত ভূতনাথ চাটুজ্জে। সে এখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট; সরকারের ঘরে তার দহরম-মহরম; সরকারী কর্মচারীরা তার ঘরে আসে; দারোগা তাকে খাতির করে।

সে গরীবদের খেতে দেয়, শাসন করে। দান করে—আবার উৎপীড়ন করে আদায় করে। বন্দুক নিয়ে বিলে হাঁস মারে। তার লোকে মদ চোলাই করে—সেই মদ করে আকণ্ঠ পান। গোটা অঞ্চল তার খাতক—গোটা অঞ্চলের সে শাসক, গোটা অঞ্চলে সে উৎপীড়ন করে আদায় করে। আবার এই অঞ্চলে সে দাতা। গ্রামে থাকে না, এক ক্রোশ দূরে একটা মহলে একখানা বাগানবাড়ী করেছে—সেইখানে যায়। থাকে। আবার আসে। সকল ভদ্র-লোককে সে ছেড়েছে। তার সঙ্গী আছে লাঠিয়াল দুজন, আর কয়েকজন দুর্দান্ত চাষী। মদ খায়।

বিপিন বললে—ওই মদ! মদেই এমন হয়ে গেল! আর বুঝেছ—মদের সঙ্গে যা জোটে তাই। তার সঙ্গে ক্ষ্যামতা। শুধু আগুন নয়—আগুন বাতাস—তার সঙ্গে খড়-কাঠ-ঘি—যা নিয়ে আগুন জ্বলে তাই সব মিলে—সেই মানুষটা। মানুষটা রাগী ছিল, অহঙ্কারী ছিল—কিন্তুক খুব মন্দ তো ছিল না। এ সেই—সেই ধানের সুদ ছেড়ে দেয়া তো মনে আছে!

নারান বলেছিল—হ্যাঁ। সেও ভাবছিল। বিপিন বলেছিল, বিয়াল্লিশেও লোকটা স্বদেশী আন্দোলন করতে গিয়েছিল—আগস্ট মাসে। মদ খেয়েছিল বলে কংগ্রেসীদের সঙ্গে ঝগড়া হল। তো চলে এল—বললে দূর তোর আন্দোলন! তার পরেতে রূপলাল ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর ছিল, তাকে বোর্ডে জবাব দেওয়ালে—নিয়ে নিজে মেম্বর হল। তা' পরে পেসিডেন হ'ল। নিজে খুব খয়রাত করলে। খরচের দিকে তাকায় নি। একটু চুপ করে থেকে বললে—বুঝলে, সম্পত্তি-টম্পত্তি যদি শ্বশুরের না হয়ে ওর বাপের হ'ত—তা হলে হয়তো এমনটা হ'ত না। বুঝলে! টাকাপয়সার ওপর এত টান, অত্যাচার করে আদায়—বুঝলে, এটা এই জন্যে। তার ওপর মেয়ের নেশা ধরিয়ে দিলে রূপলাল। কোথা থেকে এক খেতে-না-পাওয়া বিধবাকে নিয়ে এল—। নিজেই এনেছিল। তাকে দেখে খেপল। তারপরে লড়াই। রূপলালকে খালে পুঁতে দিয়েছে। মেয়েটা কেড়ে নিয়েছে।—রূপলাল এখন ওর শত্রু। কিন্তু কি করবে ওর!

নারান তখনও ভাবছিল—শুধু ছোট একটি হুঁ-ই পুরেছিল। ভাবছিল নিজের কথা। ভগবানকে ডেকে বলেছিল—একটু সহ্যশক্তি দিয়ো। না-হলে একটা ছেলে আর ওই মেয়েটা—ওরা ভেসে যাবে! কিন্তু—। আশ্চর্য লাগছে—এই দেড় বছরের মধ্যে এমন ভীষণ ভয়ঙ্কর হয়ে গেল! পৃথিবীর মালিক কি শয়তান হয়েছে! শয়তান ভগবানকে বধ করেছে—না বেঁধে বুকে পাথর চাপিয়ে হতচেতন করে দিয়েছে!

—কি করে হয়েছি? তা জানি না। ভাবি না তো কখনও। তবে হয়েছি। চোখে দেখ। বলেছিল ভূতনাথ নিজেই। নারান শুনেছিল। হিরণহাটি ইস্টিশানে একদিন সে ট্রেনে উঠেছে, সদরে যাবে, ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুল্‌স্-এর কাছে। পাঠশালাটা খুলেছে আবার। এডের দরখাস্ত করবে। তার কামরার পাশেই ইণ্টার ক্লাস। তার ইণ্টার ক্লাসের একজন বাবু লোকের সঙ্গে কথা বলছিল ভূতনাথ চাটুজ্জে। তাকে ডেকে ভদ্রলোক

সবিস্ময়ে বলেছিল—এ কি চেহারা হয়েছে! ভূতনাথ হা হা করে হেসে বলেছিল—খুব খারাপ। ভীষণ ভয়ঙ্কর। নয়? দেখেছি আয়নাতে। ভদ্রলোক বলেছিল—কি করে হ'ল? সেই চেহারা তোমার! আবারও হেসেছিল ভূতনাথ, বলেছিল—কি করে হয়েছে জানি না। ভাবি না কখনও। তবে হয়েছি। চোখে দেখ। সে হাসিতে নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করেছিল নারান। নারানকে ভূতনাথ দেখেছিল। একবার তাকিয়েও ছিল তার দিকে। তারপর বলেছিল—দেখ, এক বিখ্যাত চিত্রকর একটি সুন্দর ছোট ছেলেকে দেখে তার ছবি এঁকেছিলেন। ছবিখানাও খুব সুন্দর হয়েছিল। নাম দিয়েছিলেন দেবদূত। খুব খ্যাতি হল তাঁর। কিছু দিন পর তাঁর ইচ্ছে হল—এর ঠিক উল্টো ছবি আঁকবেন। পিশাচ তিনি খুঁজতে লাগলেন। মনের মত কুৎসিত ভয়ঙ্কর তিনি কোথাও খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি জেলখানা খুঁজতে লাগলেন। খুঁজে পেলেন একজন ভয়ঙ্কর কয়েদী। ভীষণদর্শন। তিনি অনুমতি নিয়ে তার ছবি আঁকতে লাগলেন। একদিন কয়েদীটা হাসছিল। তিনি বললেন—হাসছ কেন বল তো? সে বললে—দেখ, আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন একজন আমার সুন্দর চেহারা দেখে ছবি এঁকে নাম দিয়েছিল দেবদূত। চিত্রকর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বললেন—তুমি সেই? সে হেসে বললে—আমিই সেই। তিনি বললেন—কি করে হলে তুমি এমন? সে বললে—তা তো জানি না। তবে হয়েছি। আমি সেই! তা বন্ধু, আমিই সেই।

বন্ধু স্তম্ভিত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নারানও। বন্ধু বললে—কিন্তু, কেমন আছ নিজে? ভূতনাথ হেসে বলেছিল—দোর্দণ্ডপ্রতাপে হৈ হৈ করে বেশ আছি। মদ খাই। দেশের লোকে ভয় করে, মৃত্যুকামনা করে, আমি মরি না। খবর পাই, আমাকে মারবার পরামর্শ হয়, কিন্তু আমি নির্ভয়ে ঘুরি। আমি মরব না।

ট্রেনখানা ছেড়ে দিয়েছিল—ভূতনাথবাবু মাস্টার-মাস্টার বলে হাঁকতে হাঁকতে স্টেশনের ভেতরে ঢুকেছিল। নারান ভাবতে ভাবতেই গিয়েছিল সারা পথ।

কি করে হয়েছি জানি না, তবে হয়েছি। হয়। আর গল্পটাও সমস্ত পথ সে ভেবেছিল। কি ভয়ঙ্কর! হ্যাঁ, ঠিক বলেছে—হয়েছে। কি করে হয়েছে, কেন হয়েছে—সে নারান জানে না, বুঝতে পারে না, তবে হয়েছে। আরও বিস্ময় লাগল তার এই যে, ভূতনাথ জানে দেশে তার শত্রুও অনেক হয়েছে। রূপলাল তার শত্রু, ফেলা মোড়ল তার শত্রু, ঐ ভূষণ পাল তার শত্রু, কেষ্ট দাস তার শত্রু, কানাই বাউড়ী তার শত্রু। শত্রু তার অনেক। শিবু ডাক্তারও তার শত্রু—শত্রু না হোক, তার বিরোধী—সক্রিয় শত্রু হয়তো নয়। তার মধ্যে সে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। দিনে নয়, রাত্রেও সে চলে গ্রাম অতিক্রম করে নদী পার হয়ে শস্য-ক্ষেত্রের মাঝ দিয়ে বন-জঙ্গলের ভিতরের পথ ধরে তার সেই প্রমোদ-ভবনে—কিম্বা প্রমোদ-ভবন থেকে ফেরে গ্রামে। পদব্রজেই বেশী—কখনও গাড়ীতে। সঙ্গী তার কখনও একজন, কখনও দুজন, কখনও চারজন। নিস্তব্ধ রাত্রি তার ভারী পায়ের আওয়াজে চমকায়, তার স্খলিত কণ্ঠের শাসনবাক্যে শিউরে ওঠে। মানুষ এমন ভাবে ভীষণ হয়ে ওঠে সে শুনেছিল,

দেখে নি। ডাকাতদের সে জানে, রাম ভল্লাদের সে জানত। তারা অনেক ভীরু এর চেয়ে। মানুষের সাড়ায় তারা লুকোয় —এ মানুষকে তাড়া দিয়ে সাড়া দেয়।

কাল—একমাত্র কাল ছাড়া এর আর কৈফিয়ৎ নেই। বহু যুগের, হয়তো কয়েক শতাব্দীর গ্লানি জমে জমে একটা কাল আসে—বিষাক্ত কাল, ভয়ঙ্কর কাল, কাল—সেই কাল এমনই মানুষ তৈরী করে দিয়ে যায়। এ মরে। কিন্তু মারে কে? সে মানুষ কোথায়? সে? না। সে ভার নিয়েছে বীরেনের—নিরুর। সে শান্তি চায়। শান্ত জীবন। ভাবতে-ভাবতেই সে গিয়েছিল সদরে—ভাবতে ভাবতেই সে ফিরেছিল বাড়ী। পাঠশালার এড হয় নি। জেল খেটেছে মারপিট করে। মনটা তিক্তই ছিল, তবু তার সঙ্কল্প তিক্ত হয় নি, শিথিল হয় নি। শান্ত জীবন, শান্তি চায় সে। নিরু বীরেনকে নিয়ে শান্ত সংসার।

* * *

বেলার দিকে তাকিয়ে গোসাঁই থামল। জলের জাগ আর গেলাস টেবিলের উপর ছিল। সে জল খাচ্ছিল মধ্যে মধ্যে। এবার ঢক ঢক করে সব জলটা নিঃশেষ করে ফেললে। আমি ধীরেনকে বললাম—জল দে।

গোসাঁই স্থিরদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকালে, আকাশে সূর্য দিগন্তে নেমেছে, গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মিগুলি তির্যক গতিতে উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিম আকাশে শুক্রাচার্য এরই মধ্যে খুব স্তিমিতভাবে হলেও দেখা দিয়েছে। গোসাঁই বললে—চোখ এতক্ষণে জুড়ালো। আঃ।

আমি বললাম—তারপর গোসাঁই? আমি শুনেছি, তাকে মরতেও হয়েছিল। কাল তাকে এনেছিল—কাল তাকে এমন করেছিল বলছ—তা ঠিক, তা মানি। আবার কালই তাকে শেষ করে। মানুষ চিরজীবীও নয়; আবার তাকে ধ্বংস করবার আয়োজন কালই করে। সে কথা থাক। কিন্তু সে তোমার কি করেছিল? তোমার কিছু করেছিল, না—। কথাটা বলতে আমার বাধছিল।

আমার কথা গোসাঁই বুঝেছিল, সে বললে—করেছিল। নারান পাপীকে বধের জন্যে ভগবানের অংশ থেকে জন্মায় নি। সে সাধারণ, ছোট মানুষ। তবে বিচার-বুদ্ধি তার আছে। সে বিচার-বুদ্ধি তার তখন ছিল না। সে তার বুকে ছুরি মেরেছিল, মাথায় লাথি মেরেছিল। এখন বিচার করে সে দেখেছে। দেখেছে—ওই মাথায় লাথিটা আগে মেরেছিল, তার আক্রোশ তার ছিল। দেখুন, নারানের প্রতিষ্ঠা—তা সে কেড়ে নিয়েছিল—মানুষের দুঃখের সুযোগে উপকার করে। নারান তখন জেলে। বলতে গেলে সেই তার কারণ। নিজের রাগ তার মূল—সেই রাগেই সে চড় মেরে রূপলালের দাঁত ভেঙেছিল। তবু তার বিচারে দোষ থেকে ওই লোকটাকে সে রেহাই দিতে পারে নি। আক্রোশ ছিল। নিরু আর বীরেনকে পেয়ে তার মন ভরেছিল। বুক ভরেছিল। কাকে সে বেশী ভালবাসত তা বলা কঠিন। বীরেনকে না নিরুকে। হয়তো নিরুকেই। কিন্তু সংসার যাকে পাপ বলে, তা সে করেনি—করেনি—করেনি। আর পাপ যাকে বলে—তা নেই যে ভালবাসায়, তার স্বাদ

আলাদা, জোর আলাদা। গরীব বড়লোক হয়ে গেলে পৃথিবীর উপর আক্রোশ তার যেমন কমে যায়, মুছে যায়—তেমনি করেই মুছে গিয়েছিল—ওই ভূতনাথের উপরেও আক্রোশ কমেছিল। বরং তার সঙ্গে লড়াই করতে গেলে এদের ক্ষতি হয় এই জন্যে সে ভয়ও পেয়েছিল। বললাম তো ট্রেনের কথা। নারান ভাবতে ভাবতে গিয়েছিল সদরে, ডি আই তাকে এড্ দেন নি। ভেবেছিল ফিরে ভূতনাথের কাছেই যাবে। তার এখন উপর-মহলে খুব খাতির—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট—ওকে ডি আই-কে অনুরোধ করবার জন্যে বলবে। একটা কথা বলি নি। বলি। আগস্ট মুভমেন্টের সময়—এখানে তখন তিন-চার দল কাজ করছিল, বলেছি। তারা ঠিক করেছিল মুভমেন্টের সময় তিনটে ইউনিয়ন নিয়ে এরা একটি স্বাধীন এলাকা গড়বে। ভূতনাথও তার মধ্যে ছিল। একটা ইউনিয়নের সে প্রেসিডেন্ট। কিন্তু প্রথমেই ধনদাবাবুকে ধরে নিলে পুলিশে। হীরালালবাবু এখান ছেড়ে কলকাতা চলে গেলেন। তিনি একটা আগুন—এখানে জ্বলবার মত খাদ্য তাঁর ছিল না। ঘাস—শুধু ঘাস এখানে। তিনি চলে গেলেন মহাবনের দিকে। শিবু ডাক্তার থাকল। কিন্তু তার দলের হুকুম এল—ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। ভূতনাথের সঙ্গে মদ খাওয়া নিয়ে বনল না কংগ্রেসের। তাকে পেলে ইংরেজ। তার খাতির করতে তখন সরকারী কর্মচারীরা বাধ্য। ভূতনাথবাবু ডি আইকে বলে দিলে কাজ হত। তাই বলবে বলেই নারান ফিরল সেদিন। সন্ধ্যের সময় সেদিন আকাশে ওই তারাটি নীল হয়ে ঝলমল করছিল। সে দেখে ভাবছিল—ওই তারাটির মতই একটি শান্ত মিষ্টি, চোখ-জুড়ানো সংসার পাতবে আকাশের এক কিনারার মত সংসারের এক-ধারে।

স্টেশনে থেকেও ভাবতে ভাবতে এসে গাঁয়ে ঢুকল নারান, একটু ভাবলে—কোন্ পথে যাবে? সদর পথটায় গেলে প্রথমেই রায়বাড়ী, রায়-পাড়া, তারপর ভটচাজপাড়া, তারপর সদগোপপাড়া, তার ওধারে তার বাড়ী। ওদিকে ক'ঘর বাউড়ী বাগদীর বাস। তারপর মাঠ—মাঠের পর বিল। আর একটা পথ গাঁয়ের বাইরে বাইরে—দুটো পুকুরের পাড় ভেঙ্গে বড় বাউড়ীপাড়ার ভিতর হয়ে বিপিনের বাড়ীর পরই তার বাড়ী। রাস্তাটায় বাউড়ীরা হাঁটে, লোকে মাঠে যায়; নির্জন। যে গ্রাম এড়াতে চায়, সেও যায়। এখানে এসে অবধি নারান ওই পথেই হাঁটছিল। জেলখাটার লজ্জায় নয়। লজ্জার কাজ সে করেনি তো। মনের ক্ষোভ। লোকের ভালবাসা সে হারিয়েছে বিনা অপরাধে—সেই জন্যে। আর লোকে, বিশেষ ক'রে অবস্থাপন্নেরা, তাকে ঠাট্টা ক'রে বলত—বাউড়ীপাড়ার মালিক। বাউড়ীদের জোট—তাদেরও তো অসুবিধে ছিল। সেই মালিকানি যাওয়ায় নারানেরও মনে হত সে সর্বস্বান্ত হয়েছে। তার যে ক্ষোভ, সেই ক্ষোভের জন্য কারুর কাছে যায় নি, দেখা করে নি; ওই বাইরের পথ ধরেই হাঁটত। যাবার সময়ও সে ওই পথে ইস্টিশনে গিয়েছিল। ফেরবার সময় সে গ্রামে ঢুকবার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলে। তারপর ধরলে সদর পথ। গ্রামের মধ্য দিয়ে রায়বাড়ীর সামনে হয়ে ভট্চাজপাড়ার মধ্যে দিয়ে যাবে, ক্ষোভ তার থাক, দু-চার জনের সঙ্গে দেখা হবে; তাদের সঙ্গে কথা বলা যাবে। বিশ্ববন্ধুদের বাড়ীতে কেউ নেই, মা-

বাপ-স্ত্রী নিয়ে বিশ্ববন্ধু কলকাতায় বাসা করেছে। তবু অন্যেরা তো আছে। কথাবার্তা বলে —তার কথাটা বলবার গৌরচন্দ্রিকা করে যাবে। যদি ভূতনাথবাবুর সঙ্গে দেখা হয়? থমকে আবার দাঁড়িয়েছিল।—হ্যাঁ, তার সঙ্গেও কথা বলে যাবে। বলে সে ঢুকল গ্রামে। এবং দেখা হয়েও গেল। ভূতনাথবাবু তার সঙ্গী পাইক-গোমস্তা-মোড়ল নিয়ে বসে ছিল। ভট্‌চাজপাড়ারও দু'জন ছোকরা ছিল। তার বুকটা মনটা কেমন করে উঠল। মনে হল ফেরে। আবার মনে হল—সম্ভাষণ না ক'রে হন হন করে চলে যায়। কিন্তু তার আগেই প্রশ্ন হল—কে? স্বয়ং ভূতনাথবাবু। এবার এগুলো নারান। একটি সম্ভাষণেই প্রীত হল। গিয়ে নমস্কার ক'রে বললে—আজ্ঞে, আমি গোসাঁই। ভূতনাথ বললে—গোসাঁই? হুঁ। তা, দুটো কানই তো রয়েছে তোমার! নারান বুঝতে পারলে না। বললে—আজ্ঞে? ভূতনাথ বললে—এত বোকা নও গোসাঁই। কথায় আছে—এক কান-কাটা গায়ের বাইরে বাইরে যায়। দু কান-কাটাদের লজ্জার বালাই নাই—তারা গ্রামের মাঝখান দিয়ে যায়। তা তোমার তো দুটো কানই রয়েছে হে! একখানা চাবুক তার পিঠে যেন সপাং করে আছড়ে পড়ল আচমকা। মুহূর্তে নারান সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললে—তার মানে? ভূতনাথ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে—আমারই ভুল। তোমার দুটো কানই নেই। ও দুটো মেকী কান। একটা কান জেল খেটে গেছে—একটা গেছে রাখ্‌নী রেখে। তুমি গাঁয়ের মধ্যে সমাজের বুকে—ঘরে রাখ্‌না রেখেছ? টান হয়ে উঠল নারান। তবুও রাগকে সে যথাসাধ্য দমন করলে। করতে হল। এ তো রূপলাল নয়। রুদ্ধরোষে সে বলে উঠল—এ কথা যে বলে তার মাথায় বজ্রাঘাত হবে। হা-হা করে হেসে ভূতনাথ বললে—বজ্র ইন্দ্রের হাতে এবং ইন্দ্র তোমার ভৃত্য নয়। লোকে বলছে—আমার কাছে বলেছে সকলে—তুমি বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক পুষেছ। তুমি যেদিন গ্রামে এস, সেদিন আমিও তাকে দেখেছি। সে কে? নারান বললে—সে বীরেনের, আমার ভাগ্নের মা। ভূতনাথ বললে—সৎ মা। তোমার কে? বোনের সতীন বোন হয় না। নারান এক মুহূর্তে উত্তর খুঁজে পেলে না, তারপরই বললে—সে আমার ছোটমাসীর পালিতা কন্যা। ভূতনাথ বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, পালিতা কন্যা। মাসতুতো বোন নয়। তোমার সঙ্গেও তার বিয়ে হতে পারত। নারান চুপ ক'রে গেল। সত্যই এর উত্তর নেই। ভূতনাথ বললে—শোন গোসাঁই, ও মেয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস তোমার চলবে না। সমাজ তা সইবে না। শোন—ওকে এনেছ, আলাদা বাড়ীতে রাখ। আমি দিচ্ছি বাড়ী। শুনেছি মেয়েটি লেখাপড়াও জানে—মেয়েদের একটা পাঠশালা করে দিচ্ছি—ও পড়াক। কিন্তু এ সব চলবে না।

ঘৃণায় রাগে নারান অধীর হয়ে উঠেছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার মনের কাছে তখন তুচ্ছ-ক্ষুদ্র হয়ে গেছে, সে বললে—সমাজকে আমি মানি না। আপনার কথাও আমি বুঝি। আমি ঘেন্না করি। শুনুন—আমার জীবন থাকতে আমি ওকে বাঘ-সাপের মুখে ছেড়ে দিতে পারব না। যা পারেন করুন। বলেই সে হন হন করে চলে এল।

নিরু সমস্ত শুনে একটু হেসে বললে—এরই মধ্যে নিজের কথাটা ভুলে গেলে নারানদা?

নারানের ভুরু কুঁচকে উঠল, বললে—কোন্ কথা ? নিরু বললে—আসবার দিন গ্রামে ঢুকবার মুখে আমাকে দেখছিলে, আমি বললাম—দেখতে নেই। দেখো না। তুমি বলেছিলে—গাঁয়ের লোক দেখবে এবং দেখে কি বলবে তাই ভাবছি। আমি বলেছিলাম—যা বলে বলুক। এ তো জানা কথা। বীরেন না থাকলে আমি সইতে তোমাকে বলতাম না—আমিও সইতাম না। তোমাকে রেহাই দিয়ে চলে যেতাম। কিন্তু বীরেন—সে তোমার, সে আমার। তার জন্যে যা সইতে হয় আমি সইব, তুমিও সহ্য কর। নারান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—সইব। তাই সইব নিরু। বলে উঠে গিয়ে মাথায় এক ঘটি জল ঢেলেছিল সেই অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রে—তখন অল্প অল্প শীত পড়েছে। তারপর এক ঘটি জল খেয়ে বীরেনকে পড়াতে বসেছিল। বীরেনের বয়স ন বছর হল, কিন্তু দেখতে সে ক্ষয়া—ছোট। চেহারা তার মায়ের মত, খানিকটা নারানের সঙ্গে মিল আছে।

বুদ্ধি খুব প্রখর নয়, কিন্তু ভারী মিষ্টি ছেলে। বাপ অর্থাৎ হৃদয় থাকতে পড়াশুনা তার হয়েছিল, কিন্তু ভাল হয়নি। নিরুর সঙ্গে হৃদয়ের বিয়ের পর থেকে নিরু ওকে কিছু পড়িয়েছিল ; নিরু পড়াতে ভাল পারে না—তবে গল্প বলে ভাল—ওদের দুজনের বন্ধনের প্রথম গ্রন্থি ওখানেই। বীরেন পাঠশালা শেষ করেছে, পড়ছে ক্লাস থ্রিতে। বই কম নয়। নারান ওকে আবার দ্বিতীয় ভাগ থেকে শুরু করিয়েছে। সে তাতে ভারী বিরক্ত। বলে—না মামা, পুরনো বই ক্যানে পড়ব। মামা অনেক বুঝিয়ে থাকে ; সে খুন-খুন করতে করতেই পড়ে। হঠাৎ নারান ওকে ছুটি দিয়ে দিলে। বললে—থাক, আজ থাক। বীরেন বাঁচল। সে বসল গিয়ে মায়ের কাছে।—মা গল্প বলো। নিরু বললে—পড়া হয়ে গেল এর মধ্যে ? বীরেন বললে—হ্যাঁ, এক পাতা পড়েছি। "কদাচ কাহাকেও কুবাক্য বলিয়ো না। কখনও কাহারো হিংসা করিয়ো না। মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ। যে মিথ্যা কথা বলে—তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না।" সব পড়েছি। মামা তবে বললে—ছুটি। নিরু একটু চুপ করে থেকে বাইরে এল। নারান চুপ ক'রে উঠোনে অন্ধকারে গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নিরু ডাকলে—নারানদা! নারান মুখ ফেরালে, বললে—বল। নিরু বললে—মাথা এখনও ঠাণ্ডা হল না নারানদা ? আমাদের আর অকূলে ভাসিয়ো না। ওই ওই বাচ্চাটার কথা ভাব। নারান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—নিরু, মাথা ঠাণ্ডা করতে চাচ্ছি, হচ্ছে না। নিরু চুপ করে রইল—উত্তর খুঁজে পেলো না। হঠাৎ বললে—এক কাজ কর না নারানদা ? নারান বললে—কি ?—আমি বরং চলে যাই। তার কথায় বাধা দিয়ে নারান বলে—না। স্বর তার গম্ভীর, রূঢ়। আবার একটু ভেবে নিরু বললে—তা হলে চল, এ গ্রাম থেকে চলে যাই। এবারও বাধা দিয়ে নারান বলেছিল—না। বার কয়েক পায়চারি করে বলেছিল—এতটা হার মানতে পারব না। পরদিন সকালে নিরু তাকে দেখে বলেছিল—তোমার চোখ লালচে হয়েছে নারানদা। কাল রাত্রে ভাল ঘুমোও নি। না ?

সেই তার চোখ লাল হওয়া শুরু।

গোসাঁই বললে—অগ্রহায়ণ মাস তারপর পোষ মাসের অর্ধেক। এর মধ্যে নারান অনেকটা শান্ত হয়েছিল—কিছু ঘটে নি। বিশ্ববন্ধু চিঠি লিখেছে—"আর ঝগড়া বাড়াইয়ো না। আমি যাইব। মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। ধৈর্য হারাইয়ো না। মহাত্মাজীর দিকে তাকাইয়া দেখ।" সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী হতে চলেছে বিশ্ববন্ধু। তার উপযুক্ত চিঠি। সে হেসেছিল। কিন্তু নিরু বলেছিল—কেন, কি অন্যায় লিখেছেন? সে বলেছিল—একটু, বেশী নয়, একটু অন্যায় আছে। নিরু বিরক্ত হয়ে বলেছিল—কি সেটা শুনি? সেটা নারান বলেছিল—মহাত্মাজী মহাত্মাজী, আমি নারান। সংসারে বেকার। পাঠশালার পণ্ডিতি গিয়েছে। এখন ধানের সময় ধান তুলছি; দুটো ফসল লাগাচ্ছি নিজে হাতে। এর পর কি করব তাই ভাবি। ধৈর্য আমি মহাত্মাকে দেখে শিখতে পারি?

তবু সে ধৈর্য ধরেই ছিল। কারুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে নি। সকলকে এড়িয়েই চলে। বিলের ধারে বসে থাকার সময় বেড়েছে। কিন্তু পাখী মারলেও সে কিছু বলে না, চুপ করে বসে থাকে। আকাশ থেকে পাখীগুলো গুলি খেয়ে পড়ে—সে দেখে। সে বুঝেছে—মেনে নিয়েছে—মানুষের গুলিতে মরবার জন্যেই ওদের সৃষ্টি। তিনটে গুলিতে পাখা-ভাঙা পা-ভাঙা হাঁস সে কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। চুন-হলুদ দিয়ে তাদের দুটোকে বাঁচিয়ে একটা বাঁশের খাঁচা করে রেখে দিয়েছে। বীরেন সেগুলোকে নিয়ে আনমন থাকে। সেই খাওয়ায়। এই সময়ের মধ্যে চোখের লাল তার অনেকটা কেটেছে; মাথার যন্ত্রণা হ'ত—কমেছে।

সে দিন সরস্বতী পূজো। এক ক্রোশ দূরের সাহারা অবস্থাপন্ন লোক। তারা এবার সরস্বতী পূজো করছে। সেও কালের বাতাস। গ্রামে সরস্বতী পূজো আছে ব্রাহ্মণদের। তাদের ওখানে গত বৎসর সাহাদের ছেলেরা ঘরে ঢুকে ব্রাহ্মণদের ছেলেদের সঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি দিতে চেয়েছিল—কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তা দেয় নি। এবার সাহারা-বাড়ীতে পূজো এনেছে। তারা তাকে পূজো করবার জন্যে চিঠি লিখেছিল। ওখানকার ব্রাহ্মণেরা রাজী হয় নি। নারানের খুব ভালো লেগেছিল। সে উৎসাহিত হয়ে নিমন্ত্রণ নিয়েছিল। ভোরে উঠে সে সেখানে চলে গিয়েছিল। পূজা সেরে সন্ধ্যার আরতি সেরে বাড়ী ফিরে এসে উঠোনে পাথর হয়ে গেল। নিরু দাওয়ার উপর পড়ে আছে উপুড় হয়ে। তার মাথার গোড়ায় বসে বিপিনের মা—বললে—ওঠ মা, ওঠ। সারা দিন খেলে না। উপোস দিয়ে এমন করে পড়ে থেকে কি করবে বল। একপাশে বীরেন যেন শোকার্ত দিশাহারার মত বসে আছে।

নারান কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দেখেও কিছু বুঝতে পারলে না। বিপিনের মা বললে—এস বাবা! দেখ কুলুচ্ছুদ্দি! জানলে আমরা বারণ করতাম—তা—।

নারান বললে—কি হল?

তার কণ্ঠস্বর শুনে নিরু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে বসল, বললে—আমি বলেছিলাম—চল—চল—এখান থেকে পালিয়ে চল। গেলে না। হল—হল মনস্কামনা পূর্ণ।

—কি হল? নারান অধীর উত্তপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

—এই দেখ কি হল। নিরু তার কপাল দেখালে। সেখানে একটা ক্ষতচিহ্ন দগ্‌দগ করছে। বিপিনের মা বললে—আমরা আসবার আগে নোড়া দিয়ে ঠুকেছে বাবা।

নারান মাথা ঝাঁকি দিয়ে চীৎকার করলে—কেন? কি হল?

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নিরু প্রশ্ন করে উঠল—আমি বেশ্যা? আমি বেশ্যা? আমি—। আর সে বলতে পারলে না—হা-হা করে কেঁদে আবার লুটিয়ে পড়ল।

বিপিনের মা বললে—বীরেনকে নিরু যেতে দেয় নি, বীরেন ধরেছিল সরস্বতী পূজোর ওখানে যাবে। কিন্তু বীরেন এক ফাঁকে সেখানে গিয়েছিল—পুষ্পাঞ্জলি দেবে। বামুনের ছেলেদের সঙ্গে বসেছিল সে—তাকে ধরে তুলে দিয়েছিল। যা। ঘরের বাইরে যা। ওই ছোট জাতের ওখানে দাঁড়াগে, কানও মলে দিয়েছিল। বীরেন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এসেছিল। নিরু ওকে দেখতে না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পথেই বেরিয়েছিল। পথের উপর নিরু জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হল? বীরেন বলতে পারে নি, কিন্তু ওর সঙ্গে আসছিল ক'টি বাউড়ীর ছেলে, তাদের একজন বললে—ওগো, ও পূজো করতে গিয়েছিল—তা ওর কান ধরে টেনে আমাদের সাথে দাঁড় করিয়ে দিলে। বললে, যাঃ, তু বামুন নস। পূজো করতে পাবি না। তাই—ও কাঁদতে কাঁদতে—।

নিরুর মাথায় আগুন জ্বলত না—কিন্তু সেদিন সইতে পারে নি—মাথায় আগুন জ্বলেছিল—হয়তো কপালের আগুন মাথায় ধরেছিল। সে বীরেনের হাত ধরে হন হন করে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সরস্বতী-পূজো তলায়। একেবারে সামনে গিয়ে বলেছিল—কে কে আপনারা আমার ছেলেকে পূজো করতে দেন নি? কান মলে নীচে নামিয়ে দিয়েছেন? কেন? কেন দিয়েছেন? কেন? তার তখন জ্ঞান ছিল না। মাথার কাপড় খসে পড়েছে—চোখে জ্বালা—অনাবৃত মুখে সে দাঁড়িয়েছিল। গ্রাম্য মেয়ে নয়, শহরের মেয়ে। তাকে দেখে শুধু লোকে বিস্মিতই হয় নি—ওই প্রশ্নের উত্তরও তাদের যোগায় নি।

অকস্মাৎ একটি রূঢ় গম্ভীর কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছিল—নেমে দাঁড়াও। ওখান থেকে নেমে দাঁড়াও, বলতে বলতে পাশের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ভূতনাথবাবু। তাকে দেখে সম্বিত ফিরেছিল নিরুর। মাথায় কাপড়টা টেনে দিয়ে সে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল—কেন? এ পূজো তো গ্রামের সকলের, কারুর একার নয়।

—হ্যাঁ। গ্রামের হিন্দুর। পতিতের নয়, সোনাগাছি রামবাগানের বেশ্যাদের নয়। নান। নাম। নাম।

সে ধমকের মুখে নিরু দাঁড়াতে পারে নি। সে যেন এক একটি নিষ্ঠুর আঘাত। সমবেত মানুষের জোড়া জোড়া চোখ যেন সহস্র ধিক্কারে ধিক্কৃত করেছিল—সে ছুটে বাড়ী পালিয়ে এলো—মাটিতে বসেই লুটিয়ে পড়েছে। একবার মাথা ঠুকেছিল। কপালটা ফেটে গেছে। জলস্পর্শ করেনি—ওঠেনি। উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেছে।

আবার নেভানো আগুন দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছিল নারানের মাথায়। সে হাতের জিনিসগুলো সেইখানে ফেলে তখনই ছুটেছিল।

বিপিনের মা ডেকেছিল—নারান—নারান! ও বাবা!

নারান শোনে নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উঠেছিল নিরু, কেন উঠেছিল সেই জানে—উঠেই সে জ্ঞান হারিয়ে সশব্দে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে।

চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল বীরেন—মা গো! মা—মা!

নারান এবার ফিরেছিল। না ফিরলে—সেই দিন সেই সন্ধ্যাতে নারান মরত। ঘটনাটা এমন হ'ত না।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত নারান বসে ছিল জেগে। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল। অসহ্য যন্ত্রণা। মনের মধ্যে চিন্তা তাল পাকিয়ে একটা বজ্রপিণ্ডে পরিণত হয়েছিল। সব কল্পনা পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল—সেগুলো ওই একটা সঙ্কল্পে, আকার-অবয়বহীন সঙ্কল্পে পরিণত হয়েছিল—'খুন। ওকে খুন করবে সে!' নিরুও অন্য ধারে বসে ছিল। স্তব্ধ স্পন্দনহীনের মত। যেন এ বাড়ীতে সদ্য কেউ মরেছে। তার সৎকার করে এসে তারা দুজনে বসে আছে। বীরেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

একসময় পেঁচা ডেকে গেল কর্কশ কণ্ঠে। দূরে মাঠে শেয়ালেরা ডেকে উঠল। নারান নড়ে বসল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তার পর বললে—এর শোধ আমি নেব নিরু, ওর রক্তে আমি এর শোধ নেব। দুঃশাসনের বুকের রক্ত নেওয়ার মত। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। ওঠ, যাও, শোও গে!

নিরু উঠে ঘুমন্ত বীরেনকে কোলে তুলে নিয়ে অকম্পিত মৃদু কণ্ঠে বলেছিল—সেদিন আমি নিজেকে তোমার পায়ের তলায় ঢেলে দেব। বলে সে ঘরে ঢুকে গিয়েছিল।

নারান বার বার মাথা নেড়েছিল—না—না—না!

পাঁচ

—জল। গোসাঁই বললে—জল। আমি বললাম—ওই যে। গোসাঁই এবার জাগটা তুলেই আলগোছে জল খেলে। তারপর বললে—এর পর আর কিছু মনে নেই। মাথার যন্ত্রণা—অহরহ যন্ত্রণা, চোখে জ্বালা—চোখ লাল, মন অস্থির—বুকের ভিতরটায় একটা অসহনীয় উদ্বেগ। হ্যাঁ। উদ্বেগ ছাড়া কি বলব? শুধু ওই ওক চিন্তা। সময়ের সঙ্গে সব কমে। কিন্তু কমলো না নারানের। বাড়ল। চার মাস—মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ। চার মাস—।

থামল গোসাঁই, বলল—না, একটা কথা মনে পড়ছে, বলতে হবে। হ্যাঁ, বলতে হবে। নইলে নারানকে বুঝতে পারবেন না। নারানের জোরটা বুঝতে পারবেন না।

নিরু সেদিন বলেছিল—যেদিন ওর রক্ত দেখে নারান এই অপমানের শোধ নেবে সেদিন নারানের পায়ে নিজেকে ঢেলে দেবে। নারান সেইদিনই ঘাড় নেড়ে বলেছিল—না-না-না।

ওইটাকে পরম সত্য করে তুলেছিল। নিরু হয়েছিল তার ভাগ্নে বীরেনের মা। কল্পনায় একবারের জন্যে অন্য কল্পনা করেনি। কথায় সে একবারের জন্যও এর সীমা লঙ্ঘন করে নি। মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে একেবারের জন্যেও তার দিকে তাকায় নি। বিলের শোভা, পাখীদের কলকল শব্দ তার কানে পৌঁছুতো না। মাঠে ফসল লাগিয়েছিল, নিজের হাতে, তার কৃষাণ কিম্বা ভাগীদার হওয়ায় বিপদ ছিল—সে ডাকে নি কাউকে। তা ছাড়া সবটা নিজে পাবে—এর জন্যও বটে···সে নিজে লাগিয়েছিল ফসল। ফসলগুলো মরে গেল না-দেখার জন্য। বীরেনকে পড়ানো ছাড়লে। কথা কইতে তার ভাল লাগত না। মানুষ উন্মাদ হয় প্রতিশোধ কামনায়—ও তাই হয়েছিল। ওর প্রতিষ্ঠা কেড়ে নিয়ে সে ওর মাথায় মেরেছে লাথি, নিরুকে তার নারীত্বের চরম অপমান করে সে ওর বুকে মেরেছে ছুরি। মর্মান্তিক যন্ত্রণায় পাগল হওয়ারই কথা। হয় নি কিন্তু—এর মধ্যে সে আর একটা জোর পেয়েছিল। নিরুর উপর লোভ থাকলে সেটা সে পেত না। নিরুকে শুধু বীরেনের মা করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে অনুভব করলে—এই অত্যাচারিত অঞ্চলটার প্রতিটি অত্যাচারিত মানুষ তার দিকেই তাকিয়ে আছে প্রতিকারের জন্য। পাড়াগাঁয়ের মানুষ অতি অল্পশিক্ষিত মানুষ। নারান—সে নিত্য ভগবানকে ডাকতে শুরু করলে। আমাকে বল দাও। আমাকে বর দাও আমি ওকে মারব। শুধু তাই নয়। কিছুদিনের মধ্যেই তার কাছে লোক আসতে লাগল। রূপলাল, ফেলা মণ্ডল, কেষ্ট দাস, ভূষণ পাল। তারাও সুযোগ খুঁজছে—ঠাকুর, তুমিও এস। কিন্তু সে তা গেল না। ওদের সে জানে—চেনে। ওদের সঙ্গে ভূতনাথের প্রভেদ নাই। ভূতনাথ ওদের তাড়িয়েছে তাই ওদের শত্রু। মিল এক জায়গায় আছে—ওরাও অত্যাচারিত, সেও অত্যাচারিত। তবে সে শুনেছে ওদের হত্যার কল্পনা। নানান কল্পনা ওরা করে। মদ খায় ভূতনাথ। মদ চোলাই করে তারা তার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ওর কাছে পাঠাতে চায়। সাপ ধরে বাঁশের চোঙায় পুরে জানলার ফাঁক দিয়ে নিষুতি রাত্রে ওর ঘরে সেই প্রমোদ-ভবনে ছেড়ে দিতে চায়। আরও বিচিত্র অনেক কিছু। অনেক মন্ত্রতন্ত্র বাণমারা এ-সবও করেছে। কিন্তু নারান তো তা পারবে না। সে তার মুখোমুখি দাঁড়াবে। অস্ত্র তুলে বলবে—এই নাও শোধ। শোধ। শোধ।

তিন মাস নারান ঘুরল তার পিছন পিছন। সে চলে আগে তার সঙ্গী প্রহরী নিয়ে, সে চলে তার পিছন বা পাশে—খানিকটা দূর দিয়ে জঙ্গলের আড়াল দিয়ে। নদী ওখানে গেছে এঁকে-বেঁকে—সে জলশূন্য নদীর গর্ভে গর্ভে কিনারার গা ঘেঁষে আড়াল দিয়ে চলে। সে বিলের ধারে যায়, নারান বিলের ঘাসবনে প্রতীক্ষায় থাকে। একলা সামনা-সামনি তাকে চায়। তা ছাড়াও ওই সঙ্গী—বিছে বাগদী তো সামান্য নয়। একলা দুজনকে পারবে না সে। কখনও নদীর এপার ধরে চলে—নারান ওপার ধরে চলে। রাত্রে সিঁদ কেটে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা—তাও সে পারবে না।

রাত্রেই এ অনুসরণ চলত। দিনে নয়। দিনে ভাবত। প্রতিদিনের ব্যর্থতার কথা ভেবে

দেখতে কেন পারলে না। নিরুও স্তব্ধ ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল। হাসি ছিল না, রহস্য ছিল না, কৌতুক ছিল না—দিনের কোন একটি ক্ষণেও তার পদক্ষেপে ঈষৎ একটি চঞ্চলতা—তাও প্রকাশ পেত না। বীরেনকে গল্প বলতে বলতে থেমে যেত। বীরেনও বুঝত কিছুটা। মধ্যে মধ্যে এসে বলত—মা, ওরা বলছিল—! নিরু বলত—বলুক। সে চুপ করে যেত। মধ্যে মধ্যে সংবাদ আসত—কেউ বাড়ীর পাশ থেকে বলে যেত—আজ রাত্রে। কোন দিন কেউ পাঁচটা কথা বলে বলত—আজ রাত্রে ফিষ্টি হবে গো। যেয়ো যেন। ওরা ফাঁদ পাতত। নারান ঠিক আপনার পথ ধরে চলত। কিন্তু দেখা যেত ফাঁদ ব্যর্থ হয়ে গেছে। রাত্রির বাঘ-পুরাণের নিশাচর ঠিক চলে গেল আপনার পথে। নারান নিজের চুলের মুঠো ধরে টানত, ছিঁড়ত। তারপর একদিন—।

—আঃ—বলে একটা চীৎকার করে উঠল গোসাঁই।

আমি ডাকলাম—গোসাঁই, গোসাঁই। গোসাঁই বলে—হ্যাঁ। এই রকম হয় কখনও কখনও। নইলে আমার তো মনে কোন অনুশোচনা নেই, খেদ নেই। কিছু নেই।

আমি বললাম—রাত্রে একদিন ভূতনাথ খুন হল। মাঠের মধ্যে। খণ্ড খণ্ড করে কেটেছিল তাকে। সে তো জানি।

—হ্যাঁ। অন্ধকার রাত্রি সেদিন। সে চলেছিল ওই প্রমোদ-ভবনে। বৈশাখ মাসের রাত্রি—সন্ধ্যেবেলা ঝড় হয়ে গেছে প্রচণ্ড। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি। ঝড়ের পর সে বের হয়েছিল। আমি নদীর ঘাট থেকে পিছু নিয়েছিলাম। যাচ্ছি—সে আগে চলেছে—দম্ভের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে। ভয় তার ছিল না। বীর ছিল সে। অসুরের মত বীর, বিক্রমশালী। সেদিন ফাঁদে পড়ল। রূপলালদের দল যে জায়গার চারিপাশে লুকিয়েছিল, ঠিক সেইখানেই এসে পড়ল। সেটা আমার ওই জমির টুকরো—যেটার জন্যে আমি এসেছি। সে যেমন এসেছে অমনি তারা চারিপাশ থেকে এসে ঘিরে দাঁড়াল। সে হাঁকলে—কে? কে একজন বললে—যম। সে হা-হা করে হেসে উঠল। ওর সঙ্গী বিছে লাঠি ধরে দাঁড়াল। কে একজন পিছনে থেকে ছুঁড়লে দা। বিছের কাঁধে বসে সে পড়ে গেল। একজন তার বুকে পা দিয়ে চেপে ধরে দাঁড়াল। ভূতনাথের তখনও ভয় ছিল না। হাতে সে বন্দুক রাখত না। রাখত একটা গুপ্তি। গুপ্তিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—আয়। কিন্তু যাই হই, আমি বামুন—এটা বৈশাখ মাস মনে রাখিস। সে কৌতুক করছিল তখনও। আয়! ফলও হয়েছিল—বৈশাখ মাস—সে ব্রাহ্মণ। কে আঘাত করবে? নারান তখন এসে পড়েছে—সে হাতের দা-খানা দৃঢ় মুঠিতে ধরে—আমি! বলে এসে দাঁড়াল। ভূতনাথ চমকে উঠল। মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বোধহয় আমার থেকে নির্দোষ কারুর উপর আমার মত অত্যাচার করে নি।

তারপর আর মনে নেই। আমি দা তুলতে অনেকগুলো দা উঠেছিল। এক সঙ্গে পড়েছিল। যদি আমারটা পড়ে থাকে—তাই পড়েছে—তবে আমি বীর, আমি তপস্যায় সফল হয়েছি। কিন্তু সে মুহূর্তটি ভয়ঙ্কর। অতি ভয়ঙ্কর। মহাকালকে যেন সাক্ষাৎ দেখেছিলাম।

কাল দৈত্য অসুর সৃষ্টি করে, অনুকূল হয়ে তাদের বর দেয়, তারা সেই বরের বলে সৃষ্টিকে জর্জরিত করে তোলে প্রহারে প্রহারে। তখন মহাকাল চিরকালের ধর্মে জাগেন—সঙ্গে সঙ্গে জাগে মানুষ। তারা তাঁর সঙ্গে নাচে তিনি যখন ওই দৈত্য অসুর নাশ করেন। বহু লোক যাকে ধ্বংস করে সে ঈশ্বরের দণ্ডে দণ্ডিত, সেখানে হত্যাকারীরা মানুষ নয়, শক্তি। মহাশক্তি এই ভাবেই মহিষাসুর বধ করেছিলেন।

নারান তাই বলে। বললে গোসাঁই। নারানও সেদিন নেচেছিল। সেও মহাকালের অনুচরের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। জ্ঞান ঠিক ছিল না। জ্ঞান থাকলে সে ছুটে গিয়ে বাড়ী থেকে ঘুমন্ত নিরুকে টেনে তুলে দেখাতে আনত না। রক্তাক্ত হাতেই সে তাকে টেনে তুলেছিল—ওঠ। এস। নিরু তার মূর্তি দেখে বিহ্বল ভয়ার্ত হয়ে বলেছিল—কোথায়? সে বলেছিল—'অসুর' বলি হয়েছে, দেখবে এস। এস। সে ভয়াল মূর্তির কাছে নিরু মূক, নিরু পুতুলের মত হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার রাত্রে—পথ অনেকটা, সন্ধ্যার ঝড়ে বিপর্যস্ত পথ,—সেই পথে পথে সে পুতুলের মতই অনুসরণ করেছিল। না বলবার মত মন ছিল না—তার সত্তা ছিল না।

—ওই দেখ। নিরু দেখে আর্তনাদ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি। বিশালকায় মানুষটা খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে আছে। নারানও এতক্ষণে—কি হয়েছে সঠিক করে দেখেছিল। ওঃ, কি আক্রোশ মানুষের। ওঃ। তার মুখখানা দেখে শিউরে উঠে নিরুকে টেনে ছিল—চল। চল। সে এক বীভৎস-অশ্লীল দৃশ্য। সে বলা যায় না। নারান বলতে গিয়ে পারেনি। পারে না।

নিরুকে নিয়ে সে ফিরল। বাড়ী ফিরে নিরু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে—তুমি কি ভয়ঙ্কর নারানদা! উঃ! নারান অবাক হয়ে গেল। ঠিক এই মুহূর্তটিকে পাঁচিলের ওপাশ থেকে কে বলল—কেঁদো না ঠাকুরুন। চুপ করে মুখ বুজে থাক। নইলে ঠাকুরের ফাঁসি হবে। যাও, হাত-পা কাপড়-চোপড় ভাল করে ধোও। ওগুলো বিলে পুঁতে দিয়ো।

কে সে—আজও নারান জানে না। নিরু চুপ হল না, পাথর হল।

* * *

জেলখানায় এ চোখ সাদা হয়ে এসেছিল, মাথার যন্ত্রণা কমেছিল। ক'দিন পর পুলিশ নারানদের ধরে চালান দিলে। রূপলাল, ফেলা মোড়ল, কেষ্ট দাস, ভূষণ পাল, নারান—এক দল। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি। নারান ওই রাত্রের পর সকালে শ্রান্ত, একটু উদ্বিগ্ন মন নিয়ে উঠেছিল—কিন্তু তার গ্লানি ছিল না। পুলিশ লাশ চালান দিলে সদরে। ভূতনাথের আত্মীয়রা যায়নি। তারা কুশপুত্তলীটুত্তলী কি করেছিল। মর্গ থেকে ভূতনাথের দেহ নিয়ে যারা সৎকার করেছিল—তাদের মধ্যে নারান ছিল। সৎকার করে মনে মনে বলেছিল—আমি তোমাকে মুক্তি দিয়েছি। হেসে গোসাঁই বললে—ওটা নারানের সাফাই বলেন আপত্তি করব না। থাক। পুলিশ চালান দিলে। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে সেসন্‌স্ কোর্টে বিচার হল। বিচারের সময় নারান বলেছিল—আমি নির্দোষ। সে সেটা

অন্তর থেকেই বলেছিল। তিনজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। নারান আর রূপলাল আর ভূষণের। বাকী সব খালাস পেল। নারান টলে নি। সে প্রসন্নমনে দণ্ড নিয়েছিল। বীরেন নিরুর জন্যে ভাবে নি। নিরু এই চেয়েছিল। সে তাই দ্বীপান্তর হাসিমুখেই যাবে। নিরু অসংখ্য নিঃসহায় মা যেমন সন্তানকে বুকে করে থাকে, তেমনি থাকবে। নিরুও দেখা করতে আসেনি। বিচারের সময় রূপলালরা উকিল দিয়েছিল—তার জন্যে সরকার থেকে উকিল দিয়েছিল। কিন্তু রূপলালরা আপীল করলে। তাকেও সই করতে বললে—সেও করলে সই। সবসুদ্ধ পাঁচ মাস। পাঁচ মাস পর হাইকোর্ট থেকে সকলে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। যখন জেল থেকে বেরুল, তখন নারানের চোখ প্রায় সাদা। বাড়ী ফিরল নারান।

বাড়ী শূন্য। ঘর তালা দেওয়া। সে ডাকলে—বিপিনদা! ভিক্ষে-মা! বিপিন বেরিয়ে এল। কথা বললে না—তার দিকে তাকালে না—সামনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সে তার কাছে গিয়ে ডাকলে—বিপিনদা! নিরু বীরেন কই? বিপিনদা?

বিপিনের চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল। নারান আবার পাগলের মত তাকে ঝাঁকি দিয়ে ডাকলে—বি-পি-ন-দা!

বিপিন বললে—নাই।

—না—ই! চীৎকার করে উঠেছিল সে।

—বীরেন নাই। মারা গেছে। ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা গেছে।

সে হিরণহাটি স্টেশনে গিয়েছিল মামলার রায়ের খবর আনতে। সেখানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের খবর নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটেই এসেছিল সারা পথ। পথে হুঁচোট খেয়ে নখ উঠে গিয়েছিল। বাড়ী ফিরে সেও কেঁদেছিল, নিরুও কেঁদেছিল। একদিন পর পা পাকল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। ধনুষ্টঙ্কার। তৃতীয় দিন মারা গেল বীরেন। নিরু প্রথমটা বুক চাপড়ে কেঁদেছিল। তারপর পাথর হয়ে গেল। তারা পতিত। নিরুর নামে অনেক অপবাদ, তার সৎ-ছেলের সৎকার করতে তো কেউ আসবে না। ভূতনাথ নেই। রায়-বাড়ী আছে। কে আসবে? হয়তো বা ভয় সবার নয়। ঘৃণা! নারান খুন করেছে। খুনী।

বিপিন বললে—সারাদিন কেউ এল না। নিরু মরা বীরেনকে নিয়ে পাথরের মত বসে রইল। বিপিনও প্রথমটা আসতে পারেনি। ভয়'তো তারও আছে। মানুষের মন—তারও মনে হয়েছিল এতটা করা নারানদের ঠিক হয়নি, ওকে পঙ্গু করে দিলেই পারত। দুইই বটে। কিন্তু শেষে রাত্রি যখন ভোর হল, তখন সে গিয়ে বললে—চল মা! আমার যা হবার হবে। চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি বীরেনকে, তুমি সঙ্গে চল। কি করব—চল, নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি, কিম্বা মাটি খুঁড়ে সমাধি দিয়ে আসি। নিরু নীরবে নিঃশব্দে তার সঙ্গে গিয়েছিল। নদীতে ভাসায়নি, নদীর গর্ভে সমাধি দিয়েছিল। স্নান করে ফিরে বাড়ী এসে বিপিন বলেছিল—মা, আমার বাড়ীতে এস। একলা ও বাড়ীতে থাকতে হবে না তোমায়। আমি তা দেব না। নিরু নীরবে তাই শুনেছিল। সারা দিন একটাও কথা বলেনি, কাঁদেনি।

রাত্রেও এই বাড়ীতেই শুয়েছিল। কিন্তু সকালে উঠে কেউ তাকে দেখেনি। দোরটা খোলা ছিল।

বিপিন খুঁজেছিল নদীর ধার—বিলের চারিপাশ। হিরণহাটি স্টেশনে খোঁজ করেছিল—তাও খোঁজ পায়নি।

নারান স্তব্ধ হয়ে শুনেই গিয়েছিল। তার পর দিন থেকে আবার তার চোখ লাল হল। সেও খুঁজেছিল নিরুকে অনেক—পায়নি। রৌদ্রে-জলে-শীত-গ্রীষ্মে অনেক খুঁজেছে। খুঁজতে খুঁজতে চোখ হয়ে গেল রক্তের ঢেলা। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

এ নারানের রক্ত-সংকেত। আমার কাছে এস না। কিছুদিন পলিটিক্স করব ভেবে শিবু ডাক্তারের দলে ঢুকেছিলাম। কিন্তু বন্যার সময় ওরা প্রথম খোঁজ করেনি, খোঁজ করেছিল শ্যামাপতিবাবু—শ্যামাপতিবাবুর সঙ্গে শিবু ডাক্তারদের বিরোধ—তাই শিবুদের দল ছেড়ে দিয়েছি। কোন দল আমার নেই। আমি শুধু মানুষ। আমি যা করেছি, তার জন্যে আমার খেদ নেই। ভেবে ভেবে শেষ দেখলাম—ও ভূতনাথ আসে, নারান আসে। এই হয়। হয়তো কালের একটু রকমফের আছে। কিন্তু নিরু বীরেন? বীরেন চলে গেল। কি করব? মানুষ মরে। কিন্তু নিরু?

আমি ভাবতে পারি না—নিরু সেদিন মরা ছেলে নিয়ে বসে ছিল—কেউ আসে নি। আমার চোখ তাই বলে—কেউ এস না—কেউ এস না আমার কাছে—আমি চাই না কাউকে। ঈশ্বর আমার কাছে মৃত, সমাজ আমার কাছে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন। আমি একা রক্তচক্ষু নিয়ে বসে আছি। শুধু সান্ত্বনা—আমি লড়েছি। আমি শোধ নিয়েছি। তবে ওতে মন ভরে না।

একটু থেমে নারান বললে—বিশ্ববন্ধু এখন অনেক উন্নতি করেছে—সে কলকাতায় মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে চোখ মাথা দেখিয়েছিল। কিন্তু কিছু হয়নি।

ছয়

হয়েছিল। সেটা দেখে এসেছি। কিছুদিন আগে ধনদাবাবু এম-এল-সি ফোন করেছিলেন। তোমার সঙ্গে নারান গোসাঁই একবার দেখা করতে চায়। চমকে উঠে বললাম—নারান গোসাঁই? ধনদাবাবু বললেন—আমার বাসায় রয়েছে। সে নিরুর খোঁজ পেয়ে এসেছিল। আবার চমকে উঠলাম—নিরুর খোঁজ? বলতে বলতে বুকটা ধড়ধড় করে উঠল। তবে কি শেষ পর্যন্ত—ধনদাবাবু ওদিক থেকে বললেন—কাল সন্ধ্যায় দাহ করে আমার বাসায় এসেছে গোসাঁই। বললাম—দাহ করে? নিরু নেই? ধনদাবাবু বললেন—না। শেষটা নাকি সজ্ঞানে খুব ভাল গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় ছিল এতদিন। ধনদা বললেন—পাগল হয়ে গিয়েছিল—প্রায় উন্মাদ। ওখান থেকে এসেছিল কলকাতা। সোজা গিয়েছিল দমদম। ওদের ওখানে বাড়ী ছিল, শুনেছ তো? সেখানে গিয়ে ওই সেই বাড়ীর আশে-

পাশে ঘুরত। হাতে একটা ছোট খেঁটের মত নিয়ে বলত—খুন করে দীপান্তর যাব। সে কুকুরকেও বলত। মানুষকেও বলত। গাছকেও বলত। পড়ে থাকতে ওদের পুরনো চেনা প্রতিবেশীর বাড়ীর বাইরে। ধুলো-কাদা মাখত। ঘুরত। দিলে খেতো। না দিলে খেতো না। তারপর এই দিন পনেরো আগে অসুখ হল। পড়েই থাকত। হঠাৎ জ্ঞান ফিরল ক'দিন আগে। তখন একখানা চিঠি বিপিনকে লিখিয়েছিল যে, যদি নারানের খোঁজ জান তো জানিয়ো। মরণের আগে জেনে যেতে চাই।

চিঠি পেয়ে নারান এসেছিল। দুদিন সেবা করে ওর শেষকৃত্য করে আমার বাসায় এসেছে।

ছুটেই গেলাম। নারান নিরুর খোঁজ পেলে—পেলে মৃত্যু-শয্যায়। পৃথিবীকে সমাজকে সে অভিসম্পাত কি দেয়—শুনতে গেলাম। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম। সৌম্য শান্ত নারান উদাস প্রসন্ন মুখে বসে আছে।

নারান বললে—আসুন, আসুন, আসুন। নিরুর খোঁজ শেষটা পেলাম জানেন—

বললাম—শুনেছি।

সে বললে—আর আমার কোন নালিশ রইল না, বুঝলেন? দুঃখ তো বড় কথা নয়—সেও দুঃখ পেয়েছে, অনেক পেয়েছে, আমিও পেয়েছি। তবু সেও অন্যায় কিছু করেনি। আমিও করিনি। বাস, এই জানলাম, দেখা হল—সব পাওয়া হল। আবার কি? তবে সুখ-শান্তি পেলে আরও ভাল হত। ভূতনাথ এমন না হয়ে গেলে আরও ভাল হত। কিন্তু সব ভাল সুখের হয় না। যুগের যে একটা যন্ত্রণা আছে, প্রতি যুগেই যে তা পেতে হয় মানুষকে। যে সইতে পারে, মুখ বুজে যুঝতে পারে—সে পার হয় যুগ-যন্ত্রণার সীমানা। তখন আর চোখ লাল থাকে না, কোন যন্ত্রণা থাকে না।

হঠাৎ থেমে বললে—এই দেখুন আবোল-তাবোল বকছি। একটা খবর বলি। মাথার যন্ত্রণা আর নেই। চোখ দুটো একটু সাদা হয়নি? হয়ে যাবে। একেবারে গ্রীন।

আমি তার রক্তের ঢেলার মত চোখ দুটোর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। প্রশ্ন করলাম নিজেকে, হয়েছে কি? হয়েছে?—নারান বলছে হয়েছে।